জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রকাশিকা :
সুরেখা দাস
শরৎমেলা
৭৬/১১ অবিনাশ ব্যানার্জী লেন
হাওড়া-৭১১১০৪

মুদ্রাকর :
উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস
১৬, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

পরিবেশক :
আধুনিক পুস্তক প্রকাশন
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুধাজিৎ সেনগুপ্ত

উৎসর্গ

বন্ধুবর মুরারি মণ্ডলকে

১

সাদা বকনা বাছুর কোলে নিয়ে একটা মানুষ মাটির সড়ক ভেঙে যাচ্ছে। বত্রিশ বছরের মাঝারি স্বাস্থ্যের কালো পুরুষ, গায়ে ঢলঢলে সাদা হাফশার্ট, কোমরে বাঁধা গিঁটুর সামান্য নিচে ঘের ঝোলা লাল সবুজে লুঙ্গি, পায়ে লাল ধুলোর রেণু আবরণ। দম ধরে বাছুর বহনের জন্যে পুরুষালি সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটা মুখের চোয়াল শক্ত, চোখ স্ফীত, দাঁতে দাঁত, লোমকূপ ভিজিয়ে ঘামগড়ানির অস্বস্তি জ্বালায় কপালে গালে চিবুকে কুঞ্চন, হাতের ছাঁদে ভার টানুনিতে শিরদাঁড়া ঝোঁকা, পা ফেলায় জড়টান। দেখে মনে হতেই পারে হাত ছিঁড়ে বাছুরটা পড়ে যাবে।

সড়কে দেখার মানুষ নেই। সামনে ক্ষয়া একটা কালভার্ট। কালভার্টের নিচে ভাঙচুর খালটির স্বল্পায়তন কাদাটে জলে দুটো বক, কাছাকাছি গুয়েশালিক হাঁটা-ফেরা করছে, খালের ধারে বাবলাগাছে হয়ত ফিঙে কি টিয়া কি চড়াই, উড়ানে বোঝা যায় না, ওদিকে বনপায়রা গুটিকয় নেমে ঠোঁট হাতড়ানিতে ব্যস্ত, খানিকটা দূরে এক মেয়েমানুষ ঝোপের পাশে ঝুড়ি রেখে ঝুঁকে আছে ঝোপে, শুকো কাঠকুটো সংগ্রহ করছে বোধহয়, আর একটি প্রাণী মানুষটির পিছনে হাতদুই দূরে, গাঁয়েরই রাস্তার কালো একটা কুকুর। মধ্যে মধ্যে চোখ তোলায় একটা মতলব তার কাজ করছে। ধরেই নিয়েছে বাছুরটাকে ভাগাড়ে ফেলতে যাচ্ছে, তার খাদ্য হবে, লম্বা লালাসিক্ত জিভে তারই ঝরানি টেনে চলেছে।

কুকুর কেন মানুষ দেখলেও এটা ভাববে, 'বাড়াতে' চলেছে বুঝি। 'বাড়ান' হল মৃত গরুকে ভাগাড়ে ফেলা। ফেলা বলতে নেই, ভগবতীকে অশ্রদ্ধা জানান হয়, এবং এ কর্মে সহযোগিতা চাইলে, না-করা পাপ। কিন্তু মরেনি তো, মরে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিত করতে চেহারায় গাঢ় ছায়া ফেলেছে, মাংস শুকিয়ে হাড়ের উপর চামড়ায় লোম খসা কালি বর্ণ নিয়েছে, পা গোড়ায়, পেটে চোনা আর গোবর ছিড়ানির দাগ নিয়েছে, চোখের আশেপাশে জল ঝরানির পিচুটি আর কালো আস্তরণ পড়েছে। গোপালপুরের পাঁচু গো-চিকিচ্ছে করে, জ্যাঠার শিক্ষে। গাছের ছাল, পাতা, জড়ি-বুটি, হুঁকোর জল, আখের গুড়, আদা, মধু, ভাতের ফ্যান ইত্যাদি ইত্যাদির অনুপানে বিস্তর ওষুধ চালিয়েও কিছু হল না। শিবপুরে তাই গরুর ডাক্তার

যেখানে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সরকারী প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র। ইনজেকশান, ক্যাপসুল ট্যাবলেটে যদি বাঁচে।

যে-আক্রোশে সূর্যের অগ্নিতরঙ্গ চাটাল জিভ হয়ে চামড়া চাটার ছ্যাঁকা লাগাচ্ছে। বোশেখের ঘণ্টা বেজে যাওয়া মানেই মধ্যাহ্ন। ফাল্গুনে চৈত্রেই প্রকৃতি সরসতা মুছে এখানে নারকেল খোল। কালবৈশাখীর তাণ্ডব করুণায় আবহমণ্ডল স্নিগ্ধ হয়, তারও দেখা নেই। মাটি ঠুকলে কাঁসার বাসনের বুঝি ঠনঠনানি উঠবে, বাতাসে অস্বস্তি, ক্ষণে ক্ষণে পিপাসা, আলপথ, শূন্য ক্ষেত, মাটির সড়ক, ঝিমধরা গাছ, শুকো ঝোপঝাড় হাঁ হাঁ করছে। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে মানুষটারও। সামান্য পথকে ক্রম বৃদ্ধির রোগে ধরেছে। টানা নিয়ে যাওয়া যায় না। একবার করে নামাতেই হয়, আবার তোলাতে দ্বিগুণ ভার হয়। তবু মানুষটা নিয়ে যাবেই। ফেলার পাত্র নয় মানুষটা, টের পেয়ে কুকুরটা পিছু ছাড়ে।

মানুষটার নাম অটল। বকনাটা তার নিজের। অটল 'গাংঠিপালে'র বাগাল। গাংঠিপাল হল গাঁয়ের বিভিন্ন ঘরের গরু চরান পাল। একটা দুটো গরুর জন্য তো বাগাল পোষা যায় না। যাদের বেশি গরু তারা পোষে বাগাল। অটলের কাজ সকালে গরু খুলে সারাদিন চরিয়ে বিকেলে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া। গরু পিছু রেট পাঁচ টাকা, বাছুর ছাড়, গাই দোহান থাকলে আলাদা সাত টাকা। অটলের পাল বিশাল নয়। পঁচিশও হবে না। কোনক্রমে তাকে চালাতে হয়। খেয়ে না খেয়ে চালান জন্ম-স্বভাব অটলদের। কিন্তু স্ত্রী চিনির মৃত্যুরোগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দেনদার হতে হয়েছে।

অটলকে দেনা দিয়েছে ছিদাম। চিনিকে বাঁচাতে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে তখন। বন্ধুর ঘরে কাঁসার থালা বাটি, রুপোর হাঁসুলি, হার সুদে জব্দ হয়েছে। কিছু দাও বলতে বন্ধু গড়গড়িয়ে সুদসমেত হিসেব ধরিয়ে দেয়। সামগ্রী আন, টাকা নাও। যা নিয়েছ তাতেই তোমার কোমরের লুঙ্গিটা পর্যন্ত খুলে নেওয়া যায়। এদিকে ঘরের বিছানায় চিনির কাতরানি। হাঁড়িতে একমুঠো দেবার মত চাল নেই। তার অমন ঢলঢলে বৌ যেন প্রেতিনী। পড়শীরা বলে, 'মরবেক গো অটলের মাগ'। সামনে বলে, 'আহা হা সোনার পিতিমে কাঠিসার, ও অটল বড় ডাক্তার দিখা, ভাল হন্ যাবে।' কেউ বলে, 'মায়ের থান নিয়ে যা, ঝাড়ফুঁক করা।' উপদেশের পাহাড়। পাঁচটা টাকা ধার চাইলে দরদ বাষ্প উধাও। এদিকে ডাক্তার-বাবু খসখস করে লিখে যাচ্ছেন। চিত্রকূট ওষুধের দোকানে ধরতে চল্লিশ-পঞ্চাশ। তখনই ছিদাম বলল, 'দাও পয়সা, শোধ দিবে এখন।' তারপর দশ বিশ পঞ্চাশ করে

সাড়ে তিনশ। সুদের কথাই নেই। আহা, বড় মায়ার শরীর ছিল ছিদামের। হ্যাঁ, ছিল। ফট করে মরে বসেছে। বৌ বাপের ঘরে চলে গিয়েছে। তাকে দেনা দেওয়ার কথা জানেই না। তা বলে দেনা তো উঠে যায়নি। ধর্ম আছে না। মাথার উপরে অদৃশ্য সহস্র চক্ষু আছেন না। দিনে সূর্য আর রাতে চাঁদ নক্ষত্রের চোখ জ্বলে না তাঁর। ফলে খাও না খাও, টাকা দিতেই হবে। চিনি শেষপর্যন্ত মরেছে, সে তো মরেনি। ছিদাম মরেছে, ওর বৌ আর ছেলেমেয়ে তো মরেনি।

ছিদামের মাটির দোতালা ঘরে তালা ঝোলে। উঠোনের বেড়া উধাও। ওদিকে খামারবাড়ি ফাঁকা। ঘরের উঠোনের জামগাছটায় যার খুশী ডাল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ছিদাম যখন ছিল, কী লক্ষ্মীশ্রী ঘরের। গাঙ্গুলিদের এগার বিঘে জমি চষত। কী সুন্দর স্বাস্থ্য, গাট্টাগোট্টা, শক্তিও ধরত। বুকে ব্যথা, ডাক্তার আসার ধৈর্যটাও রইল না, মরে বসল।

আমোদপুরে ছিদামের শ্বশুরঘর। বৌ সেখানে আছে। অটল সঞ্চয় করে আসছে। হলেই দিয়ে আসবে। ধর্মকে সে বলে, 'শোন ধরম, আমি ঠিক শোধ দেব। একটু ধৈর্য ধর বাপ।' মহাশূন্যের সহস্র চক্ষুকে বলে, 'তুমি তো দেখছ আমি চেষ্টা করছি।'

ধর্মকে বড় সমীহ করে অটল। এই ধর্মের জন্যেই বকনাটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। আশ্রয়ে রয়েছে গোধন—অবলা জীব—তাকে দেখা তোমার ধর্ম। তার আহার, সুখ সোয়াস্তি, অসুখবিসুখ সবই তোমার দায়িত্বে। মায়া নয়—মায়া করতে অটলের বয়ে গিয়েছে। তার ঢলঢলে চেহারার শ্যামলা অমন যুবতী বৌ, বড় বড় চোখ, পাতলা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক, অমন সুডৌল স্তন, হাঁটলে ছন্দ গড়ে শরীর, বুকে জড়ালে নরম ফুলের স্তূপের মত সৌগন্ধ আর স্বাদে ডুবে যাওয়া ঘটে, সে মারা যায়, মারা যেতে পারে যখন, তখন দুনিয়াতে কী থাকল না থাকল তাতে বয়ে গেল অটলের। এই যে খড়ো চাল তার ঘর, বারান্দা, উঠোনের সজনেগাছ, স্থলপদ্ম কিংবা পাড়াপড়শী কিংবা এ গ্রামখানাই থাকল আর গেল, ও নিয়ে অটলের মাথা-ব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, ধর্ম বলে ব্যাপারটা রয়েছে, যা দেহ গেলেও ছাড়ে না, আত্মার সঙ্গী হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে অটলের অগাধ বিশ্বাস। পড়াশুনা করেনি, মা ছিল, শৈশবে মরেছে, গরুবাগালি করছে দশ বছর বয়স থেকে, তার আগে ন্যাংটো হয়ে ঘোরা, মাছ শাক করা, বাপের পিছনে থাকা। বাপ চাষ করত সিংহিদের জমি। সে জমি হরত পেত, কিন্তু গরু বাগালিতে সে মত্ত হয়ে থাকল। ওই বাপও ছিল বড়ই ধর্মভীরু। বলত, চুরি করবি না, পরের ক্ষেতি করবি না, নাব্য লিবি,

নাহা দিবি, মিথ্যে বলবি না, সবার মধ্যে ঠাকুর থাকে, পকামাকড় সাপখদ্প, বাঘ সিংহ, বড়দের ছটদেরকে সবার মধ্যে। কাউকে কষ্ট দিলে ঠাকুরও কষ্ট পায়। আর ভাবিস্ লুকিয়ে করছি, হু, হু বাবা লুকোবি কাকে। হাজার চোখ। দিনের বেলা সূর্যির চোখ জ্বলে, রাতে তারা আর চাঁদ, তু কী করছিস্ সব দেখে। সব লেখা থাকে। তুমি ধম্মে আছ, না অধম্মে আছ। তার বিচার হয় খাতা খুলে। যুধিষ্ঠির একটা কুকুরের লেগে সগ্গে যায় নাই, ওই অধম্ম হবে বলে!'

'যুধিষ্ঠির কে বটে বাবা?'

'ধম্মপুত্তুর। পাঁচ ভাইয়ের বড় জনা। আহা মহাভারতের গপ্প বলি নাই। গিন্নিমা সুর করে পড়ত। আমি কতদিন শুনেছি। সেই কুরুক্ষেত্তর।'

'ভীম গদাযুদ্ধ করেছিল। জানি। জানি।'

'হুঁ। দুর্যোধন রাজ্যি দেয় নাই। তার লেগেই কুরুক্ষেত্তর। যুধিষ্ঠির জেবনে মিথ্যে বলে নাই। তাই দেহ নিয়ে সগ্গে যেছিল।'

'সগ্গ আকাশের উপরে বটে, দুই বল।'

'হাঁ। যুধিষ্ঠিরের পিছা নিয়েছিল, একটা কুকুর। সগ্গের দুয়োরে পেয়াদা ধরলেক, তুমি চল হে, কুকুর যেতে পাবে না। যুধিষ্ঠির বলে, তা কী হয়। আমার সঙ্গে এসেছে, উকে ছাড়তে পারব না—থাকুক সঙ্গে। পেয়াদা বললেক, সগ্গে ঢের সুখ। নাচ গান আমুদ, ঢেক ঢেক লুচি, মিষ্টি, ভাত। কী সুখেন। যুধিষ্ঠিরের লুভ হয় না শুনে, বলে, আমি কুকুর ছাড়ব নাই, সগ্গে কাজ নাই। তখন কুকুরটা—ওমা কুকুর কোথা ধম্মরাজ। বললেক, ধন্যি বটে তুমি। মানুষ লও দেবতা। পরিক্ষে করছিলাম! যাও সগ্গে। তুমি ধম্ম মান, না মানলে নরক। তা দেখেছিস্ ত বাপ নরকের ছবি, ওই যি পট দিখাতে আসে।'

দেখেছে অটল। পটুয়ারা গো মঙ্গলের গান করে। পাকানো ছবি খুলে খুলে দেখায়, নরক বর্ণন করে, চিত্র থাকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ডোবানোর, কাঁটাগাছের সঙ্গে চেপে বেঁধে রাখার, তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া, সাপ বিছের কিলবিল করা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া, কত—কত—যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের কী আর্তনাদ। কতবার পটুয়ারা আসে, কতবার দেখায়, কিন্তু মানুষের দুটো কান, এ-কানে ঢুকে ও-কানে বেরিয়ে যায়। অটলের বের হয়নি।

শিবপুর ঢোকার আগে আমের বাগান, বাঁদিকে পুকুর, সামনেই পোস্টাপিসের টিনের চাল, তারপর চারটে ঘর পেরিয়ে মোড়। বাস দাঁড়ায়, দোকানপাট, মস্ত একটা বটগাছ, তার পাশেই প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র—ডাক্তারখানা।

ডাক্তারবাবুর ধুতির উপর সাদা শার্ট গোলগাল ফরসা চেহারা, ভারী মুখের চোখে চশমা। বড় মেজাজী মানুষ। তবে দু-পাঁচ টাকা দিলে মেজাজের উপর সর জমে যায়। সরকারী ওষুধ, টাকা লাগবে কেন? না দিলে যে ডাক্তারের গা নড়ে না। পয়সা ছাড়া দুনিয়াতে কাজ হয় না। তারপরও আছে, 'কী নাম তোর, লাউ হয়েছে ঘরে', 'ওরে মুরগী নেই ঘরে, ডিম আনতে পারলি না'. 'সজনে ডাঁটা খেতে খুব ভালবাসি, দিস্ তো দু গণ্ডা।'

বকনাটাকে দেখামাত্র মুখ বেঁকে যায়, 'মরাটাকে এনেছিস্ কেন? ভাগাড়ে দিয়ে আয়। ভাগাড়ে দিয়ে আয়।'

'এঁজ্ঞে বেঁচে রইছে।'

'নেই। কোন শালা বেঁচে নেই, তুইও না, আমিও না। ক'দিন এই দশা!'

'তা মাসতিনেক হবে। আগে অবিশ্যি—।'

'ক টাকা এনেছিস্?'

পাঁচ টাকার নোট অটল টেবিলে রাখে। ডাক্তার খয়েরী সাদা গুঁড়ি যেন কাগজের মোড়কে, ট্যাবলেট দেন। ভাল করে খাওয়ানোর কথা বলেন।

মোড়মাথায় অটল বকনাটাকে ওষুধ জল খাওয়ায়। তেষ্টা পেয়েছিল বটে। আধ বালতি শেষ করল। দোকানদার বংশীকে বালতি ধুয়ে আবার দিয়ে এল। একটা খড়ের আঁটিও সংগ্রহ করে পাশের খামার থেকে। বটতলায় বকনা বেঁধে আঁটি খুলে দিল। নিজে বংশীর দোকানে পাউরুটি, চা খেল। বাড়ি যাবে বিশ্রাম নিয়ে, এখন উভয়েরই জিরেন। বিড়ি ধরিয়ে দেখল দু' দিকের দুটো বাস আসা, মোটরসাইকেল, স্কুটার, লরি ছোটা, মানুষের চলাচল। তারপর বকনাটার দড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'নে, ইবার নিজে চল্ দেখি!'

দিব্যি হাঁটে বকনা। বাহ্, মনে হচ্ছে ঘর পর্যন্ত যেতে পারবে নিজের পায়ে। ওষুধের পুরিয়া কী কাজ দিল, হতে পারে। তবে ঘর ফেরা গরুর চহটই অন্যরকম। ভারী ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঘরের টান বলে কথা। মাথায় আলো-তাপের রাগী সূর্য, কিন্তু বকনা হাঁটার হর্ষেই একটা ছাতা নির্মিত হয়ে যায় বুঝি!

হাঁটতে হাঁটতে অটল ভাবে, পালের গরু চরাতে দিয়ে এসেছে ভোলাকে। পাঁচ টাকা দিতে হবে। ওষুধে লাগল পাঁচ। মোট দশ। তারপর এই শ্রম বকনাটার জন্যেই তো। আর এর জন্য দায়ী চিনি, তাকে শূন্য করে মরে যাওয়া বৌ। গরু না হলে ঘর মানায় না, লক্ষ্মী আশ্রয় হয় না। চক্রবর্তী ঘর থেকে পালুনি নিল বকনা। গাই হল, বাছুরটা তার পাওনা, আবার গর্ভবতী হতে ফেরত দিল গাই,

বকনা থাকল ঘরে। কিন্তু কী যে হল, আসলে চিনি বিছানায়, বকনার বন্ধআমি হয় না, রোগ তো ধরবেই। রাগ হয়ে যায় অটলের। ঘর মানায় না। গরু না থাকলে ঘর মানায় না, ঘরের দেওয়ালে খড়িমাটি না দিলে ঘর মানায় না, একটা দাওয়া চালা না করলে ঘর মানায় না, উঠোনে বারমেসে লঙ্কা, বেগুন, ছুটকো তরিতরকারী না লাগালে ঘর মানায় না, হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, ঘটি, বিছানা. দেওয়ালে কালী, শিব, লক্ষ্মীর ছবি না হলে ঘর মানায় না—ঘর মানানোর জন্যে কত কী যে লাগে?

একদিন রাগ করে অটল গড়গড় এরকম বলাতে চিনির কী হাসি। হাসির চোটে মাথার চুল ভেঙে পড়ে, বুকের আঁচল খসে যায়, অঙ্গে ঢেউ ওঠে, যেন শীষের ভারে সোনালী ধানের গাছটি। সাপটে ধরে অটলের চুমু খাবার জন্যে তখন আকুলি-বিকুলি। চিনি তখন সরে যায়, 'এ মা, তুমি কী—দিনের বেলা।' বলে, 'এই বললে না ঘর মানানোর লেগে একটা বৌ লাগে।'

অটল ভাবে, ঘর মানানোর বৌ পেয়েছিল বটে, কিন্তু সুখ তাকে দিতে পারেনি। সুখ যেন পাখি। পুচ্ছ নাচাচ্ছে ডালে বসে। ধরতে গেলেই আরও উঁচু ডালে, এক গাছ থেকে অন্য গাছে। অন্নের সুখ, শাড়ি গয়নার সুখ, ঘরের সামগ্রীর সুখ কিছু না। বুকে মোচড় লাগে ভাবতে। গরুবাগালির উপার্জন আর কত। তবে চিনি দুঃখী ছিল না। দুঃখী ছিল ঘর মানানোর জন্য আর একটি জিনিসের জন্যে। সে ছেলে। ও জন্যে যেন সাধনাই সুরু করে দিয়েছিল। শান্ত হয় না, সান্ত্বনা শোনে না। ছেলেপিলে হবার জন্যে এটা সেটা খেয়েই মেয়েমানুষের শরীর নষ্ট হয়। পুজো মানত, কবচ তাবিজ ধারণ তো ছিলই, তার সঙ্গে জড়িবুটি খাওয়া। কে জানে তাতেই শরীরে বিষ হয়েছিল হয়ত।

ঘর মানাবার জন্যে মরে বসলি, এখন দেখে যা তোর ঘরের হাল। বুকের মধ্যে শোকে কালো জলের ছলাচ্ছল শব্দ। অটলের বেদনা ডিঙি তাতে টালমাটাল হয়। ঢেউ ভাঙতে হালের টানুনি শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে দেয়। সে ঘর পরিষ্কার রাখে না, মেঝে নিকোয় না, ঝাঁট দেয় না, জল না দিয়ে লঙ্কাগাছ মারে, খড়ের চালে খড় গোঁজে না, ভাতের হাঁড়ি মাজে না। লক্ষ্মীহীন ঘরে শুধু স্থলপদ্মটা ফুল দেয়। চকচকে পাতার আড়ালে গোলাপি ফুল ফোটায়। ফুলেরা শোক বোঝে না।

হাতের দড়িতে টান, পিছন ফেরে অটল। বকনাটা আলের নিচে ঘাসের দিকে মুখ বাড়াচ্ছে। আহা থাক্, সে থমকে যায়। শুকোর সঙ্গে সবুজ ক'টা ঘাস। এখন সেও আগুন থাকলে একটা বিড়ি ধরাত। হাঁটছিল বেশ, দাঁড়াতেই রোদটা কামড় দিতে শুরু করে। বকনাটাকে জোর করে সে টেনে নিয়ে চলে।

সামনে কাঁদর, বাঁকা-চোরা খাল। ইট বেরুনো সাঁকো খালটায়। পাশে খেজুর গাছ। ডান দিকে থেকে যাচ্ছে রাওতোড়া। চাষী মানুষের গাঁ। ঘরে ঘরে ধান্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে। আলপথ ছেড়ে আবার মাটির সড়ক ধরেছে অটল। আর মাইলটেকেরও কম। খানিকটা হাঁটতেই লম্বা বড় দীঘি। বৈশাখেও জল থাকে। পদ্ম ফোটে দীঘিটায়। কালো জল পদ্মপাতায় ঢাকা, ধারে দল, শোলা, নানান জলজ উদ্ভিদ।

অটলকে দীঘি পার হতে হল না। পুবপাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। মাঝামাঝি যেতেই চোখে পড়ল, ওদিকে একটা মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে। ঘাড় গুঁজে আছে একটা সাইকেল। বকনার দড়ি ছেড়ে ঢালে দ্রুত পায়ে নামে অটল। চিনতে পারে, এ যে দেঁতো জগা। পাজামার উপর সবুজ হলুদ ডোরাকাটা গেঞ্জি, কালো হাতে স্টিলের বালা, অন্য হাতে ঘড়ি, এক পায়ে হাওয়াই চপ্পল লেগে আছে। মাথা ফেটে রক্তে ভাসছে মানুষটা, কাতরানি উঠছে যন্ত্রণায়।

'কী হল! সাইকেল থেকে পড়লে!'

চোখ মেলে তাকায় জগা। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ, চোখ রক্ত ভেজা, গাল কাঁধ, গলা রক্তে ভাসছে, কাতরাতে থাকে, 'তুল আমাকে।' নিজেই উঠবার চেষ্টা করে। পারে না। যন্ত্রণার শব্দ তোলে কেবল।

'দাঁড়া—দাঁড়া তুলছি।' অটল তুলতে গিয়েও থমকে বলে, 'এ হে হে রক্তের বন্যে বইছে। ফেটি বেঁধে লে। এই আমার গামছা রইছে।'

'একটুস্ জল।'

'দাঁড়া, পুখোর থেকে আনি।' অটল পুকুরে ছোটে। হাতের আঁচলায় জল তুলতে গিয়ে চোখে, আঙুলের ফাঁকে বেরিয়ে যাবে। গামছাটা ভিজিয়ে নেয়। তারপর হাঁ মুখ করতে জগা, গামছা নিঙরায়, রক্তের সঙ্গে জগা পান করে জল, 'আঃ'। অটল বলে, 'মাথাতে গামছা বেঁধে দি। কিন্তু ডাক্তার লাগবেক। করি কী।' বলতে বলতে গামছা বাঁধা হয়।

'তুমার লেগে বাঁচলম।'

'বাঁচলি কুথা। গামছা কি রক্ত আটকাবে? গলগলিন্ বেরুছে।'

'ফনে মুচি আর ধীরে বাউরিকে খবর দিতে পারবে?'

'খুব পারব।'

'তাহালে যাও।'

অটল আর দাঁড়ায় না। থাক বকনা। সে ছুটতে শুরু করে। ভাগ্য ভালো

জোড়াকে পেয়ে যায় তেতুলতলায়। বলামাত্র সাইকেল বের করে অটলকে নিয়ে দু'জনে আসে।

অটলের আর কোন দায় নেই। শিবপুরে মোড় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ওরাই। সাইকেলে বসায় কোলপাঁজা করে। পড়ে থাকে জগার সাইকেলটা। অটল ভাবে, বাঁচবে কি। এত রক্তপাতের পর মানুষ বাঁচে? বাঁচতে পারে। মৃত্যুর হালচাল বড় বিচিত্র। সে কখন হাত বাড়ায়, কেউ টের পায় না। কিন্তু বকনাটা গেল কোথায়? অটলের চোখ খুঁজে বেড়ায়। গাঁয়ের মুখের কাছে ডোবা। ডোবার গর্ভে শুকো জায়গায় সবুজ ঘাসের ছাউনি। খেয়ে চলেছে একমনে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়। আবার থেঁতো জগার রক্তাক্ত মুখটা মনে পড়ে। ভাবে, জগা আছাড় খেয়েছে না কেউ মেরেছে! মারতে পারে। জগা ডাকাত, শত্রুর অভাব নেই, ও মরলে অনেকে খুশী হয়। তাহলে কেন সে বাঁচাল? বাঁচাবে না? মানুষের ধর্মই তো বাঁচানো, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, যন্ত্রণাদগ্ধকে শান্তি দেওয়া। আহা, জগা বাঁচুক। ওর শরীরের সব বদরক্ত বেরিয়ে নতুন রক্ত আসুক। অটলের ভাবনায় সারাতল্লাটী জুড়ে বইতে থাকে এক অনুভব, যার ভাষারূপ, মানুষের বড় বাঁচার সাধ গো। চিনিরও বড় বাঁচার ইচ্ছে ছিল। কাঠিসার হাতের আঙুল খামচে ধরে বলত, 'আমি বাঁচব গ—বাঁচব—মরতে আমার খুব ডর লাগে। আমাকে মরতে দিও না। বাঁচাও।' কিন্তু মৃত্যু শুনল না। ছিনিয়ে নিয়ে গেল। চিনুর বাঁচার আর্তি এখনও ঘরের বাতাসে থমথম করে। আহারে জগাও তো বাঁচতে চায়। দাও বাঁচতে দাও।

অটল বকনাটা ডাকিয়ে ডোবা গর্ভ থেকে রাস্তায় আনে। বাঁ দিকে তালবুনা-দীঘি। ডাইনে পাথুরে ডাঙা। দেখা যাচ্ছে চকার ঝোপঝাড়, ঘরবাড়ি। অটলের ঘর চকায়। গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়ে বকনাটা ছেড়ে দেবে, চরবে ওটা, বেলা গড়ালে ঘর নিয়ে যাবে। এখনও ঢের বেলা।

গ্রাম হিসেবে চকা একটা নাম হলেও গোপালপুরেরই অংশ। বিচ্ছিন্ন করেছে মাঝের ফুটবল গ্রাউন্ড আর গুটি আমগাছের একটা বাগান। গোটা সাতেক গাছ মাত্র। চকার বাসিন্দা ত্রিশ ঘর। লোকসংখ্যা সওয়া দুশো আড়াইশ। আঁকড় আগাঝোপ, আম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল, বাঁশ, পাকুড় আর বটগাছ খড়ো চাল মাটির ঘর, নিকোন উঠোন খামার বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। বনবিভাগের দাক্ষিণ্যে ইউক্যালিপটাস সোনাঝুরিও গাঁয়ে এখন মাথা খাড়া করে। ডোবা ছাড়া, বাঁদিকে

একটা দীঘিও রয়েছে। বাসিন্দারা সবই তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর। ভূমিহীন অথবা দু-পাঁচ কাঠা ভেস্ট জমি প্রাপক, মজুর, কিষাণ। ঝিগিরি, গরুবাগালি, কিংবা মুনিষ খাটুনির জন্যে গোপালপুর কিংবা শিবপুরের, রাওতাড়ার সম্পন্ন চাষী কিংবা চাকুরিজীবী পরিবারে যেতে হয়। চকায় প্রাথমিক স্কুল হয়েছে। খড়ো চাল মাটির ঘর। কিন্তু প্রাথমিক ডিঙোনো ছেলে নেই। পঞ্চায়েত সদস্য বাবলা বাউরি। নিজের নাম সই করতে জানে, গাঁয়ে মোড়লি তারই।

অটলকে স্কুলের সামনে সহদেবমাস্টার ধরল। হাতে তালপাতার পাখা। নিমগাছের ছায়ায় চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। স্কুলঘরের দেওয়ালে সাইকেলটা ঠেস দেওয়া। ছায়ায় সাতটি ছেলেমেয়ে, প্যান্ট, উদোম গা, মাথায় রুখু চুল, ওদের পাশে দু'টো সাদা ছাগল বসে।

'কী হয়েছে রে অটল ?'

'আজ্ঞে।'

'ওই যে ফনে আর ধীরেকে নিয়ে গেলি সাইকেলে ! কুথা ?'

সহদেব কালো রোগা বেঁটে। ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি নেই, বুক দেখা যাচ্ছে। নকোশ গাঁয়ে বাড়ি। নিজেই জমিতে লাঙল মারে। ছোটছেলে কলেজে পড়ে। বড় বি এ পাশ করে বসে। চাষে লাগতে বলাতেও ছোঁড়ার আগ্রহ নেই, চাকরি করবে। অবিনাশের পিছনে ঘুরে ভোট করেছিল, নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছিল তাতে, পার্টি তো কল্পতরু, বিস্তর না হোক খেয়েপরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা তো হবে, কিন্তু ভোট গেল, কোথায় চাকরি। এক প্রাইমারির দরজা যদি খোলে, হাইকোর্ট করে বসে আছে। সংসার অবশ্য এমনিতে সচ্ছল, জমি এবং শিক্ষকতা, এখন দুইই দুধেল কালো গাই।

'দে'তো জগা রক্তকাণ্ড, হয়ে পড়ে আছে। দেখে উঁদিকে ডাকলম্।'

'কুথা রে ? অাঁ, বেঁচে আছে না ফট্ ?'

'বেঁচে আছে। কথা বললে।'

'চোট কোথায় ? টাঙি চালিয়েছে, না ছোরা ?'

অটল বলল, 'তা কেমন করে জানব ?'

'আরে তুই প্রত্যক্ষদর্শী। জানবি না মানে !' পাখাটা জোরে জোরে চালাতে থাকল সহদেব। তারপর কী মনে হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে সামনে এল। স্বর নিচু করে বলল, 'বল্ কেনে, ডর কিসের ? আমি দারোগা বটি না পুলিশ। হারামজাদা বেড়েছিল খুব। যত চুরিচামারি সবে উ। মোড়লঘরে ডাকাতিও শালার কীর্তি।

বল্ কেনে—এই অটল।'

'কী বলব। কে মেরেছে না পড়েছে জানব কেম্নে করে। দেখি মাথা কাটা, উঠতে পারে না, জল চাইলেক, দিলম্, তাবাদে খপর দিতে বললেক। ওরা নিয়ে গেল ডাক্তার দিখাতে হাসপাতাল।'

'এ বাব্বা বাঁচবে, না মরবে? হঃ, নিকেশ করে দিতে পারল না।'

'আমি না গেলে নিকেশ হয়ে যেত।'

বিরক্তিতে মুখ বেঁকাল সহদেব, 'তাহালে উদ্ধার করেছিস্ বল।'

অটলকে হাঁটতে দেখে বলে, 'আরে আরে চলে যেছে দেখ! দাঁড়া। কী রাজকার্য আছে তোর।'

'রাঁধতে হবে। ভোলা গরু চরাছে, গাঁয়ে পাল ঢুকবে, দেখতে হবে নাই।'

'হ্যাঁ, তুই তো আবার হাত পুড়িয়ে খাস। বুঝলি, বয়স আছে, বিয়ে কর একটা।' সহদেব বলে, 'তাহলে ভাল খবর দিলি। বাপের বাপও আছে। বড় বাড় বেড়েছিল। সেদিন চেয়ারে বসে চোখ বুজে ভাবছি, বলে কী না ও মাস্টার লোকে কাজ না করে পয়সা নেয়, তুমি যে ঘুমিয়ে পয়সা নিচ্ছ। তারপর খ্যাক খ্যাক করে হাসি।'

অটল দাঁড়ায় না।

বেঁতো জগা মারাত্মক আহত সংবাদ চকাকে আলোড়িত করে দিয়েছে। ঘর ছিট্‌কে সব বাইরে, কুলির ধারে, সরকারী ইদারার পাশে, তেতুঁলের ছায়ায়, ঘর দুয়ারে, বেড়ার পাশে, পাকুড়গাছের নিচে। সব কর্মব্যস্ততা যেন স্তব্ধ। সব মুখ উৎসুক, ব্যাকুলিত সংবাদটার পূর্ণ বাখ্যান শোনার জন্যে। চাঁদু, নেতা, কানুর বৌ, আলতা, দেবী, বিনোদ, শরৎমামা, ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত চোখের তারা বিস্ফারে। সকলেই প্রশ্ন মুখর, 'এই যে অটল, হাসপাতালে নিয়ে গেল ত,' 'তুমি মারামারি দেখলে', 'জ্ঞান আছে', 'চোট লেগেছে কোথায়', 'সাঁত্য বেঁচে আছে ত' ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরে অটল, 'বাঁচামরা ভগবান জানে, ঢেক রক্ত বেরিন্‌ছে, জ্ঞান আছে, উঠতে পারছে না, কে মেরেছে কেম্‌ন করে জানব', বলে আর দাঁড়ায় না। সকালে পান্তা খেয়েছিল। ভাত চাপাতে হবে। রোদ মরে আসছে।

কাঠের উনুন খড়ের নুড়ো দিয়ে জ্বালিয়ে খেজুর পালি দিয়ে এল্যুমিনিয়ামের কালচে হাঁড়িতে চাল জলে, দুটো গোটাআলু চাপিয়ে, জগার দিদি মালতী হাজির কান্নার সুর ছড়াতে ছড়াতে। একেবারে মড়া কান্না, 'ও আমার ভাইটি তোর এ দশা কে করলেক, ও অটল কেম্‌ন আছে খুলে বল', দীর্ঘ টানে শোকের থরথরানি। মোটা বেঁটে-খাট মেয়েমানুষের মাথায় চুল এলো, ময়লা সবুজ পাড় গোলাপী শাড়ী,

ব্লাউস নেই, মেদ বহুলতার মাংস স্তূপের অজস্র ভাঁজ, কোমরে, পেটে, পিঠে ঝুলেছে। চকাতেই বিয়ে হয়েছে চরণের সঙ্গে। গোপালপুরে মিস্তিরদের জমি চষে চরণ। জগা বিয়ে-থা করেনি। দিদির কাছে থাকে। ডাকাত খুনেরা ভাইয়ের জন্যে সবাই সমঝে চলে মালতীকে। চটাতে চায় না। গরু সবার নেই, কিন্তু ছাগল মুরগী রয়েছে। লোপাট হয়ে যেতে পারে।

'ও অটলদা আমার কাছে খুলে বল। মন মানছে না। বুক ধড়ফড় করছে। -মন কু গাইছে। হেই মা কী সব্বনাশ হল, কোন খালভরা আমার ভাইয়ের এদশা করলেক। মা কালীকে পাঁঠা দুব ভাইটি ভালয় ভালয় ঘর এলে।'

'বললম্ ত ভাল আছে। নিয়ে গেল ফনে, আর ধীরে। ডাক্তার দিখাতে।'

'তবে যে সব বলছে বেঁচে নাই।'

'কে বলেছে? আমি দেখলম্ বিবি্যা জ্ঞান। তবে হ্যাঁ, ঢেক রক্ত—।'

'ভাগ্যিস তোমার চোখে পড়ল। ভগমান তোমার ভাল করবে। না দেখলে যে কী হত।'

'সাইকেলটা কিন্তু পড়ে আছে পুখোর গাবায়।'

'নিতাইয়ের বাপকে পাঠাচ্ছি।'

মালতী যেতে ভুতো। মুনিষগিরি করে বেড়ায়, আজ কাজ জোটেনি। ওর বৌ মোড়লঘরের পাটকুড়ুনি। দুটো ছেলেমেয়ে। ভুতোর লম্বাপানা মুখ, ছোট ছোট ধূর্ত চোখ, রোগা চেহারা, গলার স্বর খনখনে, মাতাল মানুষ। মদ্য পানের পর দাপাদাপি তার পৌরুষত্ব ফলায় বৌয়ের কাছে। যার জবাবও পেয়ে যায়। ইটের বদলে পাটকেল। মুখে শুধু নয় ওদের কুরুক্ষেত্রে চ্যালাকাঠ, থালা, বাটি, ঝাঁটা, লাঠি, বঁটি, কাটারির ব্যবহারও হয়ে থাকে। হাঁটুর উপর লুঙ্গি তোলা, উদোম গা ঝগড়া করার ভঙ্গীতে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে, 'তু ভেবেছিস্ কী অটল, আর কাজ পেলি না, শালা আধমরা হয়ে পড়েছিল, তোর ভাত লাগল কিসের, সটান পেরিন্ এলি না কেনে—মরলে ল্যাঠা চুকত।'

'আমিও মানুষ, উ-ও মানুষ। দেখেও চলে আসব?'

'মানুষ! কে মানুষ বটে, দেখতো। ঠোঁট কুঁচকে লালচে ছোপ পড়া দাঁত বের করে ভুতো যেন মারতে আসে। থুথুর সঙ্গে খনখনে স্বর ছিটকে দেয়, 'মানুষ লয়, উ একটা জানোয়ার, সাপ শিয়েলের বাড়া, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সব্বনাশ করে বিড়াবে ভাল লুকের।

গিয়েছে কখন কেন। বলে, 'ভেবে দেখ তুমি।'

'ভাবব আবার কী। জগা রক্তে ভাসছিল, না বেঁধে দিলে—।'

'মরে যেত।' ফনে শেষ করতে দেয় না, 'ভাগ্যিস্ তুমি খবর দিলে। থাকলে। বুঝলে কাকা টাকাটা তুমি দিলে পারত। বল তো গামছা এনে দি কিনে।'

'না। কিন্তু ফনে, জগাকে মারলে কে?'

ফনে বাঁকা চোখে তাকায়। বলে, 'শুনে লাভ কী তোমার?' তারপর সহজ হয় মুখের রেখা মুছে। ভাল মানুষটার কোন মতলব নেই, নিছকই জানার ইচ্ছে। বলে, 'পিছা থেকে না মারলে সে শালাই লাশ হয়ে যেত। দাঁড়াও, জগা একভুং ভাল হোক, পিতিশোধ লবে। কেলে সাপের লেজে পা দিয়েছে, বাঁচবে ভেবেছ!'

'তোরা মারবি? পিতিশোধ নিবি।'

অটল পলকহীন। তার রক্তে প্রবল আলোড়ন। সে যেন প্রত্যক্ষ করে, তার সামনে একটা খুন হয়ে গেল। ধারালো অস্ত্রের আঘাত এসে পড়ল একটা মানুষের মাথায়, ফোয়ারার মত রক্তধারা ছুটেছে, বিস্ফারিত চোখ, তীব্র আর্তিতে মরণমুখী এক বীভৎস শব্দ বেরিয়ে আসছে রক্তাপ্লুতের মুখ থেকে। কী ভয়ঙ্কর। থরথর কাঁপে অটল, হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

'কী হল। বা বাব্বাঃ, তোমার আবার কী হল কাকা?'

'খুন করিস না ফনে, খুন করিসনা।' কাতরতায় কণ্ঠস্বরে ভিক্ষার আকুতি ফোটে কম্পমান অটলের গলায়।

'আরে তোমার কী বটে? লখনা শালো তোমার কে?' ফনের হাসি নাচে ঠোঁটে। বলে, 'বল কেউ বটে? তুমি চেন লখনাকে?'

মাথা এপাশ-ওপাশ আন্দোলিত করে অটল আতঙ্কে। তার চোখেমুখে ভয়-ত্রাস। ফ্যাকাশে গলায় বলে, 'মানুষ ত বটে?'

'জগা মানুষ নয়?' ফনে ঝুঁকে থাকে প্রশ্নটা করে পলকহীন দৃষ্টিতে।

'জগাকে যে মেরেছে পাপের হিসেব হবে বৈ কী।'

'আমরা করব।'

'না, দেবতা আছেন রে। মানুষ হিসেব করার কে বটে। তার কাছে কারও ছাড়ান নাই।'

'দেবতা কী হিসেব করবে। ওকে ত দেখাই যায় না। সব হিসেব মানুষের

হাতে। স্বর্গ নরক কিছু নাই, যা হবার মাটির পিথিমেতেই হবে। তাহালে টাকা লিবে না, গামছাও না ?' দু'পা হেঁটেই ফনে আবার ফিরল। চাপা গলায় বলল, 'লখনাকে মারার কথা যেন আবার কাউকে বলে বেড়াবে না, মনে রেখ।' দাঁড়াল না।

কঠিন উষ্ণতার দিন যাচ্ছে। শেষ বিকেলেও দিনতাপ বায়ুমণ্ডলে আচ্ছাদন রেখে দেয়। গাছের পাতার নড়াচড়া নেই। শেষ রাতে ঠাণ্ডা পড়ে, খরার লক্ষণ। চাষের কাজ শুরুই হয়নি। এদিকে ঘাসের অভাব। শুকনো মাটিতে বিবর্ণ সবুজ গালিচা। গ্রীষ্ম কোপে গরু ছাগলের হাড় বের হয়ে যায়। রোদে সেঁকে এসব দুশ্চিন্তা অটলের মাথায় ঘূর্ণি হয়। এখন ঘরের দাওয়ায় বসে জগার কথার আচ্ছাদন—ভাল হয়ে আবার খুন, চুরি ডাকাতিতে মাতবে, লখনা কে, ওরই মত কেউ, ওর সঙ্গে কী টাকা পয়সার হিস্যা নিয়ে গোলমাল, না ওদের ঘরে ডাকাতি করেছে ! কোথা লখনার ঘর, কে আছে, ওর মা বাবা বৌ ছেলে মেয়ে নিশ্চয় আছে ! জগা তার ক্ষতি না করলে মারবে কেন, মেরে জগার ক্ষতি করল, জগা তার শোধ নেবে, তারপর সে আবার শোধ নেবে জগার উপর—ভাবনায় অটল এক ঘূর্ণন দেখে বিশাল চক্রের, যার থেকে ছিটকে আসে রক্ত, যার শব্দে উঠতে থাকে কেবলই আর্তনাদ, যন্ত্রণাকাতর প্রবল শ্বাস। অটলের চক্র ভাঙার প্রবল তাড়না জাগে। বড় অসহায় সে। তার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, প্রতিরোধের কোন বলই নেই, কেবল বিশাল এক ইচ্ছার দিনের আলোর মত ব্যাপ্তি আছে। সহসা তার মনে হয়, জগাকে বাঁচানোর জন্য তো কৃতজ্ঞ জগা, গামছার দাম দিতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, সে দাম চাইবে, অন্য দাম। বলবে, 'তুই লখনাকে মারিস না জগা। তাহলেই শোধবোধ। জগা কী কথা রাখবে না ! অটলের মনে হল, গাছের পাতা নড়ছে। আঃ বাতাস ! জোর নেই বাতাসে, ফুরফুরে, গায়ের উপর যেন আদরের হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের দাওয়ায় সে বুক ভরে বাতাস গ্রহণ করে।

২

ডলি তার হাঁসজোড়া জল থেকে তুলতে পারে না। দিনভর চরেও বুঝি পেট ভরেনি। হাঁসের খিদে মেটে না। হুঁশ নেই, বেলা নিবছে, আকাশ মাটি আঁধারের আঁচলে ঢুকল বুঝি এবার। আবহাওয়া শেষদুপুরের কালবৈশাখীর দাপটে বদলে গিয়েছে। বৃষ্টির ফিকে ওড়না উড়েছে, ঝড়েরই তাণ্ডবতা, তবে উষ্ণতা মুছে তৃপ্তির শৈত্য এসেছে। তাণ্ডব ফলে গাছের ডাল ভাঙা খড়পাত ওড়া চাল আলগা করে, বিপর্যয়ের একটা ছবি ছড়িয়ে এখন শান্তশ্রী প্রকৃতি। একটু আগে পর্যন্ত মৃদু জলে গা মোছা রোদের চমৎকার চলানি ছিল। পালের গরু ঘরে এসেছে, লোকের হাঁস মুরগীও, ডলির জোড়াটিই যেন বেয়াড়া। না, ভুলে নিয়ে গেলে ঘরের কথা মনে থাকে না।

ডলির আটহাতি লালপেড়ে সাদা জমি, না, জমি আর সাদা নেই কাদাগোলা রঙ, শাড়ীটা কোমরে বাঁধা, ব্লাউস খয়েরী, মাথায় উড়ুক্কু চুল ফুলেফেঁপে, দীঘলও বটে, কুচকুচে কালো। এক ছেলের মা, শরীররেখায় চামড়ার চিকনতায় শ্রীময়ী যুবতী। উঁচু বুক সাপটে ব্লাউস, ভারী উরু, কাঁধ, বাহুমূলে মাংসল, লাবণ্যময় চলচলে মুখের নাক সামান্য চাপা। স্বামী হারা মারা যেতে মেয়েমানুষের অনেক খামতি ঢাকা পড়েছে। বৈধব্যের শূন্যতার বদলে কুমারী গরিমা ফুটেছে।

'কোড় কোড় কোড় কোড়' এবং 'আয় আয়' ডাক দিয়ে ডলির মুখে ফেনা জমে গেল। এখন মাটির ঢিল কুড়িয়েছে। আকু গেরস্তর ঘরে বাসন মেজে এল এইমাত্র। ঘরও ঢোকেনি। ঝড় জলের সময় ওদের ঘরে। চালের অবস্থা কেমন কে জানে। পাতলা করে খড় ছড়িয়ে দিয়েছিল পুরোন চালে। চাঁদা মাঝি ভাল বাড়ুই। ওর ছাদনে ঝড় খড় আলগা করতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস কী। ঘর গেলে দেখা যাবে। এখন হাঁস জোড়া উঠুক। ছেলেটাকে পাশে দাঁড় করিয়ে ঢিল ছোঁড়ে। মেয়েলি হাতের দুর্বল ঢিল ছুঁড়ে হাঁসজোড়া ঘাট করা বড়ই শক্ত। এখন পুকুরে জলের আয়তন কম, তাতেও পেরে ওঠে না।

ডলির বাপের বাড়ির দূরত্ব চকা থেকে বিশ বাইশ কিলোমিটার। হাঁটা, বাস আবার হাঁটা। গাঁয়ের নাম কোদা। বাপের ঘর মানে মামার ঘর। মামারই

বিয়ে দিয়েছে। পাত্র হিসেবে হারাধনের দাম ছিল। তিন বিঘে বাপ্দাতি জমি, অবশ্য বাইদ ডাঙা জমি, ঘোষেদের ঘরে কিষাণীতে পাঁচ বিঘে, তারপর আধা মিস্ত্রি, চাষ ছাড়া তাতে বাড়তি উপার্জন। সব কাজ জানত, ঘরের দেওয়াল তোলা, কাঠের কাজ, লাঙল বাঁধা, দরজা জানলার টুকটাক সারাই, আধা রাজমিস্ত্রিগিরি। ঘরে বসে থাকত না। ডাক ছিল কোন না কোন কাজের। শক্ত সামর্থ্য কালো চেহারা, দাঁত উঁচু, তাতে কী, পুরুষের আবার রূপ, ডলি তো খুশীই ছিল। ওরকম মানুষটা যে মরে বসবে কে জানত। একমাস ভোগান্তি, কাঠিসার চেহারা, পায়খানা, বমি, ধরাই পড়ল না রোগ। ডলি মামার ঘর যাবার মতলব করেছিল প্রথমে। মামাতো ভাই শিবুও শ্রাদ্ধে এসে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমার ওখানে চল। ভিটের একদিকে জায়গা দেব। তখন মনে হয়েছিল, সেই ভাল। ক'দিন গিয়ে থেকেও এল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল চকাতেই থাকবে। ছেলেকে মানুষ করবে। শিবু তো আর ভাত দেবে না, তাকেই জোগাড় করে নিতে হবে। শিবুর ঘরে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সাত জন, হা হা দৈ দৈ লেগেই থাকে।

ডলি সাঙা করতে পারে, বয়স আছে, জীবনের অনেকখানি সামনে পড়ে। বেঁচে থাকার যেটুকু মাধুর্য সে তো এই শিশুপুত্রটি। কিন্তু নারী হৃদয়ের পূরক তো শিশু একক নয়। শরীরের ধর্ম আছে, পুরুষের আসঙ্গ লিপ্সার কামনা আছে। বাউড়িসমাজে সাঙা, নারীর দ্বিতীয় বিবাহ প্রচলিত, নিয়ম অধীন। ডলিতে আকর্ষিত পুরুষ যে নেই এমন কথাও নয়। প্রস্তাবও এসেছে। ন'কোশের মেয়ে আটুর বৌ বলেছে, তার ভাই হরিদাসের বৌ মরেছে, রাজি থাকলে ডলি, কথা পাড়ে। হরিদাসের খুবই পছন্দ ডলিকে। বোনের ঘর আসে প্রায়ই। ফলে বয়সে তার চেয়ে ছোটই হবে, ইদানীং তার উপর বড় প্রেমপ্রবণ হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে ওর লালসা টের পায় ডলি। আলতামাসী বলেছে, ওর ভাইপো ধজুর কথা। সাঁইথিয়ার ধানমিলের লরির খালাসী, ভাল রোজগার। কান্তও সাঙাতে রাজি, ছোটবৌয়ের কথা। তারপর এখন হয়েছে অটল। না অটলের সাড়া নেই। কথাটা জেঠীর। ওই নামটাতেই ডলির যা বিচলিতভাব। সুপুরুষ নয়, উপার্জনও খুবই কম, তবু কোথায় যেন আকর্ষণ আলোকচ্ছটায় ধেয়ে আসে। ভালমানুষের মুখেচোখে দীপ্তি, হাসিতে সরলতা, চুরি বাটপাড়ি অন্যায়ে নেই, নারীঘটিত দোষ নেই, তার দিকে চাউনিতেও বৈধব্যের জন্যে নিপাট মায়া শুধু। কিন্তু তার মনে পুরুষটির ছায়া কী বৈধব্যের পরে, জেঠীর কাছে শুনে, তার আগে নয়? অটলের বৌ চিনি তার বন্ধু ছিল, ও ঘরে কত গল্প করে এসেছে, সে তো দেখতে পেত সবই। তারও

তো স্বামী ছিল, দু' বেলা অন্ন, মোটা কাপড়, নিশিকালে শরীর স্বাদ, কিন্তু চিনির উপর অটলের যে ভালবাসা দেখেছে তার ছিটেফোঁটাও তো ছিল না। ঈর্ষা হত চিনির সৌভাগ্যে। জেঠীর কাছে শোনাতক্ শরীর কাঁপে, রক্তধারা কামতাপ পেয়ে স্বপ্ন আঁকে, প্রায়শঃ ভাবনায় ওই পুরুষ, রাস্তায় দেখা হলে তার চাউনিতে কুমারী লজ্জা নামে।

ডলি আশপাশে তাকায়। ওদিকে যেতে হবে, জলে নামতে হবে, আচ্ছা বে-আক্কেলে হাঁসদুটো। এদিকে সূর্যডোবা বেলা ফিকে কালি ছড়াচ্ছে, ঘন হয়ে উঠবে এক্ষুনি। পাখিদের জোর হল্লা ওদিকের বাঁশঝাড়ে। পাড় ধরে আসছে কান্ত, না ডাকবে না। অটল হলে ডাকত। ভাবনামাত্র অটলকে আসতে দেখে। ডলি নিজের কাছে নিজেই আশ্চর্য। পাশ ঘেঁষে পেরিয়ে যাবার আগেই ডাকে, 'শুনছ!'

অটল দাঁড়িয়ে পড়ে।

'হাঁসদুটো একটু তুলে দাও দেখিনি—পারছি না।'

'উঠছে না কেনে উরা?'

ডলি হাসে। ভালমানুষ হন্দ বোকাও বটে। না ওঠার কারণ ডলি জানবে কী করে। হাঁসেদের প্যাক প্যাক ভাষার মানে জানলে না হয় জিজ্ঞাসা করত। বলে, 'তুমিই শুধোও হাঁসকে।'

ডলি চোখের রেখায় হাসির সঙ্গে আরও গভীর কী যেন আঁকে, যা অটলের হৃৎপিণ্ড বরাবর তীক্ষ্ণ ফলকে বিদ্ধ হয়। পড়ন্তবেলায় এলোচুলে মেয়েমানুষ বড় বিভ্রম সৃষ্টি করে, আকীর্ণ হয়ে ওঠে মোহিনী জাল! চোখ, ঠোঁট, চিবুক, কণ্ঠ, স্তনদ্বয়, কোমরের খাঁজ, শাড়ির আবরিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শব্দময়তায় ভরে ওঠে। তখনই যেন তার বৌ চিনি রূপ পায়, অন্য শরীরে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুহূর্তে ডলি চিনি। অমনই মাটি টলে, গাছপালা প্রচণ্ড বেগে নাড়া খায়, বেগবান বাতাস ভাসিয়ে আনে অজস্র খড়কুটো, ভূকম্পন অনুভূত শরীর সব আবেগ উদ্গীরণের জন্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে চায়। চিনির অনুচ্চার ঠোঁটে মৃত্যু উত্তীর্ণতার জয়হর্ষ। গাঢ় অভিমান আর্দ্রকণ্ঠে বলতে ইচ্ছে করে, 'চিনি তুই! চিনিরে—।'

'কী দেখছ অমন করে, ভূত নাকি আমি। চোখ ফেটে পড়ছে, নাকের পাটা ফুলছে। হেই মা কী হল তোমার।' মেয়েমানুষ মাথার চুল সরায়, হাসে। শরীরে রং এক ভাঙচুর ঘটিয়ে ঘন হয়।

অটল অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, দ্রুত পুকুর পাবার নামে। জলের ধার ঘেঁষে মুখের শব্দ আর মাটির ঢেলা ছুঁড়ে হাঁসজোড়া ঘাটে আনে। বিরক্তির প্যাকপ্যাকানি নিয়ে

হাঁস ঘরের পথ ধরতে বলে, 'যাও, নিয়ে যাও।'

'ও ঠিক চলে যাবে। ভাগ্যিস্ তুমি এলে। কোথা যাবে?'

'একটা এঁড়ে খুঁজে পেছি না পিসির। ঝড় জলে কোথা যে গেল।'

ডলির দৃষ্টিতে চোখ সরিয়ে নেয় অটল। কিছু কী বলবে? তার দেখাটা কী অমন করে ঠিক হয়নি? কী করবে, ও যে চিনি হয়ে গিয়েছিল একটু আগে। যেন অপরাধ হয়ে গিয়েছে, সেটা ঢাকা দেবার প্রবণতাতেই বলে, 'তোমাকে আজকাল একদম দেখতে পাই না।'

'দেখার চোখ আছে তোমার!' ডলি হাত দিয়ে কপালের চুল সরায়। তার স্বর এবং চোখমুখ রমণীয় আয়ুধ হয়, ধারালো হয় হাসির উজ্জ্বলতায়। বলে, 'দেখার জন্যে মন দিতে হয় তাহলেই চোখে আসে।'

'শুনেছিলম বাপের ঘর যাবে!'

'মরতে যাব। চকাই ভাল।'

'তোমার হাঁস চলে গেল।'

'ঠিক ঘরে যাবে উরা। উদের ভুল হয় না।'

'দেখি এঁড়েট কোথায় গেল!' অটল এগিয়ে যায়।

'পাকুড়তলা দেখ গা। সাদা পারা বটে ত। আর শোন, খবর লিও। বৌ নাই, তোমার ঘর তাই যাই না। তোমার ত খবর লিয়া বটে!'

'তা বটে। হারাও তো নাই।'

'তাতে কী। তুমি যাবে। আমি কাউকে ডরাই না।'

অটল বলে, 'যাব এখন।'

'উঁহু, আজই গরু ঢুকিয়ে এস। আমি ঘরে রইছি। যাবে ত? কথা আছে।'

অটলকে বলতেই হয়, 'যাব।' সে ভেবে পায় না কী কথা! ভয় করে তার। এ তো চিনি নয়, ডলি, অন্য মেয়েমানুষ। বাছুরটাকে খুঁজতে সে এখন হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে। পিছন ফিরেও দেখে না।

ঘরে এসে হাঁস ঢোকায় ডলি। দাওয়ার একধারে কাঠের উনুন। মাটির দোতালা ঘরের ওপাশে গোয়ালের চালা। বলদ নেই। একটা বকনা ছিল, তাও মারা পড়ল অসুখে। এখন দুটো ছাগল। উনুনের পাশে কাঠকুটোয় সব জলের ছিটে লেগেছে। ঘরের চাল কিছু হয়নি বটে, কিন্তু উঠোন দাওয়া খড়কুটো, পাতা, ধুলো বালিতে ভরে আছে। ঝাঁট দিতে হবে। কাঠা দেড়েক উঠোনে একটা বড়সড় আমড়া গাছ, তিনটে মাথায় সবুজ ঝাঁটি নিয়ে ইউক্যালিপটাশ, ওদের কিছু হয়নি।

ঘর উঠোন ঝাঁট দিয়ে ডলি চা চাপায়, ছেলেকে বাটিতে করে মুড়ি খেতে দেয়। দাওয়ায় একটা বস্তা পেতে রাখে। অটল যখন কথা দিয়েছে আসবেই। একটা মধুর সম্ভাবনা তার মধ্যে বাজনা বাজায়।

অটল আসে। সন্ধ্যার আঁচল নেমেছে। অস্পষ্ট সব কিছু। লম্ফটা জ্বালাতে হবে। এখন কাঠ গোঁজা উনুনের আলো আভা শুধু ছড়ান। গায়ের কাপড় ডলি ঠিকঠাক করে নিয়ে অন্তরঙ্গ স্বরপাতে বলে, 'বস।'

অটল বসে বলে, 'কী কথা যেন আছে।'

'আছে। বস, চা খাও, বলছি।'

'আবার চা কিসের লেগে।' অটল ছেলেটাকে দেখে, 'বেশ রোগা লাগছে!'

'দেখ কেনে, ভুগছে। গোকুল ডাক্তারের ওষুধের কামাই নাই, তবু।'

'কী সুন্দর চেহারা ছিল ছ' সাত মাসের সময়।'

ডলি উত্তর দেয় না। চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে লম্ফ জ্বালে। তারপর হ্যারিকেন এনে কাচ মুছে ধরায়। লম্ফটা নিবিয়ে হ্যারিকেন রেখে দরজার পাশে দাঁড়ায়। বলে, 'জগাকে কেনে বাঁচালে তুমি! তুমার মত মানুষ সব জেনেশুনে—।'

ডলির কথা সম্পূর্ণ শোনার দরকার নেই। একই কথা নানা মুখে চকায়, গোপালপুরে। যেন সে একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু এত লোক যখন জগার বিরুদ্ধে তখন জগা কুকর্ম করার সাহস পায় কী করে! সকলে তো প্রতিরোধ করতে পারে। অটল ভাবে, এই তাহলে ডলির কথা!

'কী, হল। মুখে রা নাই।'

'বাঁচানো কি মারার মালিক আমি লই।'

'হেতু ত বট। খপর না দিলে মরে কাঠ হয়ে থাকত।'

'আমি না দিলেও অন্য কেউ দিত, যে আসত ও পথে সেই-ই।'

এমন চমৎকার নারী যার চোখ মায়াঘন শরীররেখা স্নিগ্ধতা ছড়ায়, কণ্ঠস্বর ক্লান্তি মোছে, যে নারী সন্তানের জন্ম দেয়, পালন করে মমতায়, সংসার গড়ে ভালবাসা স্নেহ প্রেমপ্রীতিতে, তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে এমন নিষ্ঠুরতা, কোন ক্রোধে এমন ভয়ঙ্করী দানবী! অটলের স্থির চোখে তারই বিস্ময় আঁকা হয়। না, মানুষের অন্তর রহস্য অদৃশ্য, বুকের জটিলতা চাক্ষুষ হয় না। সে উদ্বিগ্নতা নিয়ে প্রশ্ন করে, 'কী বলছ! এত রাগ কেনে তোমার।'

'সোনার বাপকে ওই তো খুন করেছে।'

শোনামাত্র শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে অটলের, 'বল কী! হারাদাকে ও খুন করেছে।'

'হ্যাঁ, মদে বিষ মিশিয়ে। তার জন্যে ওষুধে কাজ হয় নাই, রোগ ধরা যায় নাই। অল্প অল্প হেগে বমি করে মানুষটা চলে গেল। কোন পেমান নাই যে ধরি। একা মেয়েমানুষ করব কী!' হতাশার স্বর ছড়িয়ে ডলি বলে, 'মানুষটাই চলে গেল!'

'মারল কেনে?'

'ক দিন খুব স্যাঙাত হয়েছিল। একসঙ্গে মদ খেত, চুরিচামারিতে যেত। টাকা পয়সার ভাগ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল।'

'তুমি আটক দিতে পার নাই?'

মাথা নাড়া দেয় ডলি, 'না, সাধ্যি কী! মানুষকে মরণ ডাকলে কানে কুনু কথা যায় না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ফনে বলতে জানলাম।'

'ফনে ত জগারই দলে থাকে।'

'তাতে কী। সব আপন আপন। দল বল আর যাই বল, স্বার্থে লাগলে সব ফোঁস করে। ফনে আমাকে মজাতে চায়। আমার লেগে রাতে ঘুম হয় না। সাঁঝবেলায় আমার কাছে এসে উঠতে চায় না। আমার সঙ্গে শুলে শেতল হবে।' পরম কৌতুকের হাসি আবছায়ায় ডলি টানা বলে যায়, 'আমার দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে। জগা মদে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, ওই তো বলেছে। ও নাকি বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, বলেছিল এমন কাজ করো না, জগা শুনে নাই।'

'পাপ করেছে জগা, মহাপাপ।'

'তার শাস্তি পেয়েছিল, তুমি বাঁচালে। লখনাকেও বলিহারি, শ্যাষ করলি না।'

'লখনা মেরেছে তাহালে। ফনেও বলছিল।'

'আমারও ওরই কাছে শোনা। ছাড় তো, জগার শত্রুর অভাব! চা খাও।'

চায়ের কাপে চুমুক দেয় অটল। বলে, 'গাঁয়ে কত কী হছে, কিছুই জানি না। জেনেই বা কী হবে। আমি কীই বা করতে পারি।'

'তাহালে বোঝ, তুমি বেটাছেলে বলছ কী করতে পারি। আমি তো মেয়ে—।' সামান্য থেমে কাঠিন্য এনে বলে, 'তবে পারব।'

'কী পারবে?'

'বাঃ, ফনে আমার পিরীতের পুরুষ। আমার অঙ্গ দুলুনিতে নাচছে। নাচলে কত কী হয়।' নাচাতে পারলে কত কী করানো যায়।

অটল তবু বোকাটে প্রশ্ন করে, 'কী!'

'কেনে জগাকে খুন।' চাপা গলায় বলে উনুনের ওদিকে যায় ডলি।

অটল চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে। ভয়-ত্রাসের ঘন ঝোড়ো মেঘ অন্তর বাহির

আবৃত করে। সে প্রত্যক্ষ করে মৃত্যুর একটা রক্তাক্ত মালা ঝোলা খেয়ে খেয়ে ফিরছে। নরমুণ্ড মালায় একের সঙ্গে অন্যের রক্তসূত্র বন্ধন। লখনা, হারাধা, জগা, ফনে, ডলি আরও কত মুণ্ড। প্রতিশোধ স্পৃহার রক্ত জিহ্বার তবু হাঁ মুখ, তবু পিপাসা। দাওয়ায় সে যেন অন্ধকারে ভিজে চুপসে থাকে। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়েছে ডলি, কাঠ গুঁজে দিচ্ছে, তারই রক্তিম আভা লুটিয়ে পড়ছে দাওয়ায়, লাফ মেরে ডলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চিনিয়ে দিচ্ছে খোঁচা দিয়ে। জগাকে বাঁচানোর আকস্মিক জড়িত হয়ে পড়ায়, বিবিধ মন্তব্যে বিরক্তি লাগলেও, সে নিজস্ব মতে স্থির ছিল, সে মানুষের কর্তব্য করেছে, ধর্মের চোখে সে নিষ্পাপ, কিন্তু এখন প্রশ্ন জাগে, সত্যই কী তাই, নিষ্ঠুর, খুনী, শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখার সহায়তা কী পাপ নয়? তারপর ডলি বদলেছে। হারাধার এই বিধবা অন্ধকারের মধ্যে রহস্য ছড়িয়ে দিয়েছে তার চারপাশে, এমন ব্যবহার, এমন চাউনি, এমন ভঙ্গী, নিঃশব্দে রচনা করছে শৃঙ্খল, সে টের পাচ্ছে চমৎকার এক মাধুরিমা। পুকুর ঘাটে হঠাৎ চিনি হয়ে ওঠা ডলি, এখন ডলিই, তবু রক্তের মধ্যে ক্ষীণ এক কামাতুর সুর বয়ে যাচ্ছে।

'শুনছ!' ডলি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেয়েমানুষ। স্বর বদল ঘটিয়ে যেন অটলের স্পর্শ পেতে চায়। বলে, 'আমি একা থাকি, তুমি তো খবর নিতে পার।'

'তা পারি।'

'তাহলে আস না কেনে?' অভিমানে ভেজে ডলির কথা।

অটল বলে, 'এবার আসব। খবর লুব।'

ওদিক থেকে ধনাইয়ের বড় মেয়ে আসে। বছর চোদ্দ বয়স, ফ্রকপরা রোগা কালো চেহারা। বলে, 'কাকা তুমি!'

'এই এসেছিলাম। তু কি বলছিস্।'

'জেঠীর কাছে এসেছি। ও জেঠী, মা বললেক, দুটো কাঁচালঙ্কা দিতে—আছে।'

ডলি বলল, 'আছে। দাঁড়া দিছি।'

অটল, 'আমি তা হলে যেছি' বলে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারে হাঁটা অভ্যেস আছে। বাঁশঝাড়ের পাশেই চণ্ডীর ঘর, আর একটু এগিয়ে ফনেদের আড্ডা দাশুর ঘরে। সারা চকা আঁধারে টুপি পরে নিয়েছে। শব্দও নেই। আলোর লালচে আভা দু' একটা ঘরের বাইরে পড়েছে। একটা টর্চ যাচ্ছে আগে।

'কে বটে?'

'অটল বটি।'

'আঁধারে শালা কিছু ঠাওর হয় না। গেইছিলে কুথায়?' মদের গন্ধময় বাতাস

বেরিয়ে আসে প্রতিটি কথায়।

ঘরেই অটল টের পায় ভুতো। গলা অব্দি ভেতো গিলে এল গোপালপুরের দেশী মদের দোকান থেকে। বলে, 'ওই হারাধার ঘরে।'

'বাঃ শালা, হারা নাই, মাগী একা, সাঁঝবেলা।' কথার ঢঙে ভুতোর কৌতুক। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত রসালো যৌন অনুভূতি থেকে যার উদ্রেক। মদো গন্ধ বাতাসে ছড়ানোর সঙ্গে বলে, 'তা কতদিন থেকে এসব চলছে।'

'চলছে আবার কী। দরকার ছিল। মানুষ মানুষের ঘর যাবে না?'

'মেয়েমানুষের ঘর বল। মেয়েমানুষের ঘরে যত দরকার লাগে তত ভাল।'

'ঘর যাও। মদ আর ছাড়তে পারলে না।'

'কোন দুঃখে ছাড়ব চাঁদু। আর ঘর যাব না তো কী দাঁড়িন থাকব? মদ খাই নিজের পয়সায়। আমি শালা কাউকে ডরাই না। কুন শালা আমাকে—'

মদের নেশায় বকার ঝোঁক আসে উল্টোপাল্টা। দাঁড়িয়ে শোনা বোকামি।

'এই শোন, শালা ভালমানুষ, জগা এসেছে।'

অটল উত্তর দেয় না।

'তুই তো শালা বাঁচালি, এবার আমার মাগ সেবা করুক।' ভুতো বলার পরই হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

অটল থামে না। চকায় কোন শব্দ নেই। শুধু ভুতোর কান্নার শব্দ পিছন থেকে ছুটে আসছে। ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে। আকাশ অবিরল অন্ধকার ঢেলে যাচ্ছে। নক্ষত্র ফুটেছে মাথার উপর টাঙানো কালো চাদরের বুকে। অটল ভাবে, তাহলে জগা এসেছে। চকার আবর্তনচক্রে আবার তার ভূমিকা। ঔদ্ধত্যপূর্ণ, নিষ্ঠুর ঘাতক স্বভাবী, ক্ষতিকারক। কিন্তু সে কী করতে পারে। মানুষ কাজকর্ম করুক, খেটেখুটে শান্তিতে জীবন চালাক, সবাই অন্ন পাক, পরস্পরকে দেখুক, জীবনের ছোট্ট পরিধিটা সুন্দর হোক, তার কামনাই তো মনে থাকে। জগাকে বাঁচানোটা সঙ্গত না অসঙ্গত হয়েছে, দ্বন্দ্বটা আবার ফোঁড় দেয়। ভাবে, সে বাঁচিয়েছে, সে যদি না বাঁচাত, রক্তপাতে মৃত্যু ঘটতে পারত আবার নাও পারত, অন্য কারও চোখেও পড়তে পারত এবং সেই মানুষটা তারমতই কাজ করত, মৃত্যুকাতর মানুষকে বাঁচানোর প্রবণতার কোন যুক্তি বিচারই বিপক্ষে গ্রাহ্য হয় না। তবে যা হয়েছে, হয়েছে। অটল কোনক্রমেই জড়াবে না। ডলির প্রতিশোধস্পৃহা লখনা-জগা দ্বন্দ্ব এবং আগামী অঘটনের ভয়ঙ্করতা সে অনুভব করতে পারছে।

ফনে রাস্তায় ধরল, 'জগা তোমাকে ডেকেছে।'

'কিসের লেগে?'

'আমি তার কী জানি। পার ত এখনি যাও।'

অটল উত্তর দেয় না। ফনে দাঁড়ায় না। অটল ভাবে, ডাকুক, সে যাবে না। গেলেই সম্পর্ক, গেলেই আবার জড়িয়ে যাওয়া। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, টাকাটা হয়ত দিতে চাইবে। শুধু আজ নয়, কাল-পরশুও সে দেখা করবে না, পথে দেখা হলেও নিরুত্তরতায় সে পরিহার করবে পাপসঙ্গ। জগাকে এখন সে ভয় পায়।

দু'দিন বাদে সকালে জগা নিজেই অটলের কাছে এল। পাজামার উপর কলারওয়ালা নীল গেঞ্জি, মাথায় ব্যান্ডেজের ময়লা কাপড়, রুখু খয়েরী চুল, ঈষৎ রোগা, জ্বরাক্রান্ত চেহারা, পায়ে নতুন হাওয়াই চপ্পল। উঠোনে দাঁড়িয়ে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে বলল, 'ঘরেই রয়েছ অটলদা। আরে খবরও নাও নাই আমার।'

অটল খবর নেয়নি, জগাকে নিয়ে কোন কথা কেউ বলেওনি। চকায় জগার চিকিৎসার পর প্রত্যাবর্তন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, সংবাদ নয়, ওর থাকা না থাকা সমান, হাঁসচুরি, ছাগলচুরি কিংবা কাউকে মারধোর করলে কথা হয় শুধু। মনে হতে যাচ্ছিল সাময়িক আলোড়ন তুলেছে, মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে এসেছে এতো অতি সাধারণ কথা। সকলেরই অন্নসংস্থানের জন্যে ছোটাছুটি, রুক্ষ হইয়ে আকাশ দেবতার অনুগ্রহ বারিধারায় নামেনি, কাল ঝড়-জলের সামান্যতায় পিপাসার্ত মাটি ঢোক গিলেছে মাত্র, আবার হা-জল। গোবর, খড়পাত সার গাড়িতে যাচ্ছে মাঠে ফেলতে, ঝিয়ের কাজ করতে ছুটছে মেয়েবৌ, চাবজাল নিয়ে খালে ডোবায় মাছ ধরতে বেরিয়েছে কেউ কেউ, হাঁস-মুরগী চরছে, ছাগল গরু চরছে, ন্যাংটো কী আধ-ন্যাংটো বালক-বালিকারা খেলায় ব্যস্ত, চকা তার নিজস্ব স্বাভাবিক চিত্রে।

অটল গোপালপুর যাবার আয়োজন করছিল। দু'ঘরে গাই দুইয়ে গরু খুলবে। চায়ের বাটি ধুয়ে ঘরে রেখে উঠোনের দিকে ঘাড় তো ফেরাতেই জগা। সকালের আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে প্রত্যক্ষ সে করতে চায় শয়তানের কোন চিহ্ন জগার মধ্যে আঁকা হয়ে আছে। সেই তো মানুষের মুখ, কপাল, ভ্রূ-রেখা, নাক, ঠোঁট, চিবুক, দু'টি হাত, দু'টি পা। গাঁয়ে কতদিন থেকেই তো দেখছে। গোপালপুর

ঘর হলেও চকাই ওর ঘর। দিদির ঘরেই বেশি সময় থাকত। ওর বাবা ভগীরথকেও অটল চিনত। রোগা ঢ্যাঙা মানুষ। ভাল মানুষই ছিল। কোন বদনাম শোনেনি। কিষাণী করত। বেচারা আষাঢ় মাসে লাঙল মারতে গিয়ে বাজ খেল। জগার তখন মালতীর ঘরে আশ্রয়। অটলের জগাকে দেখা তখন থেকেই। বয়সে তার চেয়ে ঢের ছোটটিকে গাঁয়ের আর পাঁচটার সঙ্গে একই মনে হত। যা হোক দিদি আর কত ভাত দেয়। শিবপুর বাসস্ট্যান্ডে জটুর চায়ের দোকানে লাগিয়ে দিয়েছিল। গ্লাস ধুত, ঝাটপাট দিত, জটুর ঘরের কাজও করে দিত পেটভাতায়। ওই মোড়ের চায়ের দোকানে থেকেই ছেলেটা চালাকচতুর হয়ে উঠল। একদিন দেখা গেল রিক্সা চালাচ্ছে। রিক্সাটা লাহাবাবুদের। মাটির সড়কে আশেপাশের গাঁয়ে যায় যাত্রী নিয়ে। কিন্তু খুব বেশি-দিন রিক্সা চালায়নি। হঠাৎই একদিন জগার খোঁজে চকায় পুলিশের জিপ। জগা নাকি সীতে বাউরির ডাকাত দলে আছে। ধবুনার সাহা ঘরে ডাকাতিতে ছিল। চকায় এ-সংবাদ খুবই আলোড়ন তুলেছিল। সীতে বাউরির নাম সবাই জানে। পাশেই বিহার বর্ডার। সীতে বিহারের রানীশ্বরে থাকে। তবে বেঙ্গল বিহার ডাকাতির ক্ষেত্র তার সবই। কিন্তু জগা গিয়েছে ওর দলে—এ তো সাংঘাতিক সংবাদ চকার মানুষের কাছে। গুঞ্জন, আতঙ্ক, সর্বত্র ওই আলোচনা। চকার সবাই হা-অন্নের প্রজা। প্রায় সময়ই ঘরের হাঁড়ি ঢুঁ ঢুঁ। সুযোগ পেলে গোপালপুরে কী ক্ষেত-খামারে ছোটখাট চুরিচামারি যে করে না, এমন নয়, কিন্তু ডাকাতি! পুলিশের ভুল হয়েছে, এটাও ঠিক নয়। জগা গাঁয়ে এসে সদম্ভে ঘোষণা করল, সীতে বাউরির দলে সে আছে, শালা পুলিশ কী করবে। বছরতিনেক আগের এই ঘটনা অটলকে কতটা ভাবিয়েছিল মনে নেই। জগার চেহারা, জামাকাপড়, হাবভাব, ঔদ্ধত্য গাঁয়ে হাঁস-মুরগী ছাগল চুরি, ছেলেটা মহা অধর্ম করছে এমন ভাবনারাও সীমাবদ্ধ ছিল, তেমন কিছু পীড়াদায়ক মনে হয়নি। এখন তার স্থির নেত্রপাতে যন্ত্রণা আচ্ছন্নতা আসে বুকে। ভালমানুষের ছেলের সব পাপ ধৌত করার আকুলতা জাগে।

'আরে হাঁ করে কী দেখছ, আমি জগা—মরি নাই।'

অটল বলল, 'আহা মরবি কিসের লেগে।'

'তুমি গামছার দামট লাও নাই অটলদা।'

'পুরোন ছেঁড়া গামছা, দাম কিসের। লাগবে না।'

'মরেই যেতম তুমি না থাকলে।'

অটল ভাবে, জগাকে কি বলবে তার মৃত্যুকামনা করে সকলে। বলবে, জগা পাপের পথ থেকে সরে আয়, অধর্ম করিস না, খেটেখুটে খা, সংসার কর, এই আঘাত

থেকে চেতনার ফের। ঠোঁট নড়ে না, পুকমুখো ঘরে তার সকালের আলো প্লাবন। চকচকানি থাছে, ঝলানি নেই। আকাশ শূন্য মাঠের মত পড়ে আছে সূর্যের পথ পরিষ্কার করে। হাওয়ার মাধুর্য। তবে কতক্ষণ। এরপর তাপমাত্রা বেড়েই চলবে। দুটো ছাগল দাওয়ার কাছে। স্থলপদ্ম গাছটায় বসে আছে নীরব বিষণ্ণ একটা কাক। চড়ুইয়ের ছটফটানি তার খড়ো চালের মধ্যেকার বাসা থেকে উঠোন, আশপাশে। ডোবার ধার ঘেঁষে রাস্তাটায় একটা সাদা গাই বেরিয়ে গেল—গোপলাদের বটে।

'বুঝলে, ভাগ্যিস তুমি আসছিলে। লাও, সিগারেট ধর।'

'মাঝেমধ্যে বিড়ি খাই, সিগরেটে পুষায় না।'

'আরে খাও দেখি।' প্যাকেট বাড়িয়ে দেয়, 'আটটা আছে রেখে দাও—খাবে।'

অটল ঘাড় নাড়ে, 'আমাকে গাই দুইতে যেতে হবে।'

'যাবে এখন।'

'বাছুর হামলাবে। সারারাত মায়ের দুধ পায় নাই।'

'হামলাক। তোমার বড় মায়া, অত মায়া ভাল লয়, বুঝেছ।'

অটল মনে মনে বলে, ঠিকই তো। নইলে তোকে বাঁচাতে যাই জগা। বলে, 'মানুষের মায়া থাকবে না এ কেমন কথা জগা। তার জন্যেই তোর কষ্ট।'

'কষ্ট! আমার কিসের কষ্ট। কষ্ট তো তোমাদের মত ভালমানুষদের। বুঝলে দুনিয়াতে ভালমানুষরাই কষ্ট পায়। বাবার মাথাতে বাজ পড়ে, তা বাদে জটু আমাকে খাটিয়ে পেটপুরে খেতে দেয় না, রিক্সা টানাতে বলে, চুরি করছি, লাহাদের ঘরে কাঁসার থালা চুরি গেল, কী না আমি নিয়ে এসেছি লুঙ্গিতে গুটিয়ে, কত বলব। এখন শালো কেয়ার করি না।'

'তোকে লখনা মারল কেনে?'

মুহূর্তে চমকানি জগার। চক্ষুতারকা ছিটকে আসতে চায়, 'তুমি দেখেছ? ওই শালাই বটে লয়—ওই শালাই।'

'উঁহু। লখনাকে আমি চিনিই না।'

উত্তেজনায় একেবারে বুকের কাছে জগা সরে আসে, 'লম্বা, বেশ ভাল চেহারা।'

'আমি কাউকেই দেখি নাই।'

'তাহালে লখনা মেরেছে জানলে কেমন করে?'

'শুনো কথা। কিন্তু ঝগড়া কিসের?'

জগা শান্তগলায় বলল, 'ওর এক জোড়া মোষ মাঠ থেকে চুরি হয়েছে। থানাতে শালা আমার নামে ডায়েরি করে এসেছে।

'একজোড়া মোষ, দাম ত ঢের বটে।'

জগা যেন শোনে না, সক্ষোভে জ্বলন্ত চোখ আগুনে ঠিকরায়, 'শালা পিছা থেকে মারল। বাপের বেটা হলে সামনে আয়।'

'মোষ তুই চুরি করিস নাই?'

'করেছি।' সদর্পে যেন জগা ঘোষণা করে মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে, হাসে। সিগারেট ধরায়, ধোঁয়া ছাড়ে, 'কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ কে চোর। শালো প্রমাণ করুক।' যেন কৌতুক, মোলায়েম স্বরপাত, অহংকারের স্ফুট বুদবুদ, ওষ্ঠ ভাঙে, ছড়িয়ে যায়।

'কিন্তু তুই তো নিজে জানিস্!'

'তো কী!' জগা শব্দ করে হাসে।

'তোর ভয় করে না পাপকে?'

'পাপ! সে আবার কী! সে তো তোমাদের মত ভালমানুষদের ডর দেখানোর জন্য গো অটলদা।'

স্তব্ধ হয়ে যায় অটল। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ বাজে। ভয়ের অনুভূতি নখাগ্র থেকে মস্তক অবধি আবৃত করে, 'জগা আমার কাজ আছে।'

'আহা যাবে এখন। যে জন্যে এলম তাই বলা হল না!'

অটল নির্বাক আঁখি ফেলে রাখে।

'শোন গামছার পয়সা নিলে না, সিগ্রেটও না। কিন্তু তোমার উপকার কিছু না করতে পারলে আমার শান্তি নাই। তুমি কষ্টে আছ।'

'কে বলেছে। দিব্যি আছি।

'ধুৎ ওই তো গরুবাগালির পয়সা। তোমার টাকার দরকার নাই?'

মনে পড়ে যায় অটলের ছিদামের বৌকে শোধ দেবার কথাটা। বলেই ফেলে।

জগা খুশী হয়, 'দেখলে তো। এই যে লখনার মোষদুটো চালান দিতে হল। থানা থেকে মেজবাবু খবর দিলে, ওর শালার বিয়ে। দু' হাজার আড়াই হাজার খরচা। জগা দে। সর্দার তো ভাগলপুর জেলে পচছে। খুন ডাকাতিতে, এ জন্মে ছাড়া যাবে না। দল ভেঙেছে, বড় শিকার নাই অথচ টাকা দিতে হবে থানায়। যাক্ গো। ছাড়, কিন্তু ছিদাম তো ফট্। বৌও থাকে না।'

'তাতে কী। ওর বৌও থাকে না। দেনার কথা জানে না, তাতেই-বা কী বটে। ধম্ম নাই, ধম্ম জানে না।'

জগার মাথায় ব্যথাটা আছে। কেমন যেন তার ভারটার উপর মানুষটার ভাবনা

যেন আরও ভার চাপিয়ে দেয়, কতটা জাগে। ধর্ম। ধর্ম কী, কাকে বলে, কে সে? যেন নতুন কোন শব্দ, অসম্ভব শক্তি ধারক অস্তিত্ব নিয়ে সজাগ হয়ে উঠে আঘাত হানে, যাকে প্রত্যাঘাত করা যায় না, খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না, অটলের কথায় বিশ্বাসের কঠিন ধাতব আস্তরণে বাধা পেয়ে ফিরে আসে।

'ঠিক আছে, তোমার দেনা আমি শোধ করে দেব।'

'তুই কেনে শোধ করবি। তোর টাকা লুবেই-বা কেনে।'

'চুরিডাকাতির টাকা বলে।' চরম ক্রোধাগ্নি যেন শুকো অরণ্য পেয়ে যায়, প্রজ্বলিত হবার অপেক্ষায় ছিল ঘনসন্নিবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী, বায়ু দোসরে অসংখ্য শিখার আগ্রাসী জিহ্বা ক্ষুধার্তের মত এগিয়ে যেতে থাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে জগা বলে, 'কোন শালা চোর লয়, ডাকাত লয়, বড়লোক এমনি হয়, তুমি প্রমাণ দিতে পার, তোমার পায়ের কুকুর হয়ে থাকব।'

'ওসব কথা ছাড়। আমি তোকে বাঁচিয়েছি, তার শোধ দিবি তো?'

'হ্যাঁ।' জগা আবার স্বাভাবিকতায়, 'ঠিক ধরেছ। আমার মন চাইছে। জানি এমনি লিবে না। তোমাকে কাজ করিয়ে দেব।'

'কী কাজ? ডাকাতিতে যেতে বলবি?'

'ঠাট্টা করো না অটলদা, তুমি বলে তাই। অন্য কেউ হলে—।'

'শুন্, শোধ যখন দিবি, তখন চুরিডাকাতি ছেড়ে দিয়ে রিক্সা চালা, মুনিষ খাট, কত কাজ রইছে, আর মদও ছাড়। তাহালেই শোধ-বোধ। ধম্মে থাক, তোকেও ধম্ম দেখবে।'

জগা মাথা দোলায় 'ওসব হবে না। গরুবাগালি তুমি ছাড়তে পারবে?'

'তা ভিন্ন কাজ পেলে ছাড়তে পারি।'

'তাহলে ছেড়ে দাও। তোমাকে কাজ দেব।'

অটল বলল, 'ঘর যা জগা, আমিও গাই দুইতে যাই, গরু খুলতে হবে।'

ঘরে কুলুপ এঁটে অটল বেরিয়ে পড়ল।

অটলের মধ্যে যে বালকটির বাস, যে গরু চরায় দিনভর ভোলা-পদাই-বিষ্টু-গোপালদের সঙ্গে মাঠে, ডাঙায়, ডোবার ধারে, খালের কিনারায়, বনের পাশে ড্যাংগুলি, হা ডু-ডু, তালপাতার ডাঁটির ব্যাট করে তিনটে কাঠি উইকেট বানিয়ে রান করে, বাউণ্ডারি হাঁকায়, পঞ্চরসের গান করে বেসুরো গলায়, ছেলেমানুষি যে কোন উদ্যোগে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়, বোকামি মনে হয় না, সে দেঁতো জগার

প্রভাবে বড়ই হর্ষ অনুভব করে। যেন হাতে একটা লাড্ডু পাওয়া, কিংবা খেলার বল পাওয়া, কিংবা টিয়াপাখির বাচ্চা পাওয়া কিংবা নধর একটা কুকুরছানা সংগ্রহ করার মতই আহ্লাদিত হয়। সে প্রাথমিক ভাবনায় জগাকে ভালমানুষ মনে করে বসে। কেমন মন দেখ, কেমন বাঁচিয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা দেখ, তার রোজগার বাড়িয়ে দেবে, হ্যাঁ গরুবাগালি করতে হবে না। তারপর অবশ্য শঙ্কা ছায়া পড়ছে। আকাশে সূর্য আড়াল করতে আসা কালো মেঘ ফিকে থেকে একেবারে রৌদ্রকে ধুয়েমুছে পগার পার করে দিচ্ছে। সে ভাবছে, জগা ডাকাত, মোটেই সুবিধের লোক নয়, খুনোখুনি মারামারি করে, মদ খায়, লখনাকে খুন করবে—ও ভাল হয় কী করে। উঁহু বাবা অটল ওসবে নাই। কিন্তু নাই বললেই যে লাল নীল সবুজ হলুদ আলো নাচে। কাজের মধ্যে, ঘরে শুয়ে, রান্না করতে করতে, তারপর গরু চরাতে গিয়ে ধুমলনগরের ডাঙায় সে আলোর নাচন সে না দেখিয়ে পারে না। সে মুখ বুজে ছিল। কিন্তু ওরা যদি খোঁচায়, 'ও অটলকা কী হয়েছে তোমার, ক'দিনই দেখছি গুম হয়ে আছ—কী ভাবছ—শরীর খারাপ ?' তখন তো বলতেই হয়।

গরুবাগালদের মধ্যেও গোষ্ঠী রয়েছে। মাইলচারেক বৃত্ত করে যে গ্রামগুলি তার মোটামুটি সম্পন্ন চাষী ঘরগুলোতে বাগালের সংখ্যা কম নয়। বেলা ন'টা নাগাদ গরু ভেড়া মোষ ছাগলের পাল নিয়ে গাঁ ছাড়ে সব ঘাসের সন্ধানে। যেদিকে বেশি ঘাস, নিচু জমি, খাল-খন্দ সেদিকেই পাল যায়। এ-পালের গরু ও-পালে চলে যায়, বিশেষ করে বাছুরগুলো, সে বড় হুজ্জোত। যাই হোক মোটামুটি ভোলা, পদাই, বিল্টু গোপাল, কখনও নিমে আর ফালতু একসঙ্গে পাল বাঁধে। বয়সে ভোলা বছর পনের হল। সামনের বছরই চাষে লাগবে। লুঙ্গি হাঁটুর উপর ডবল ফোল্ড করে পরে, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। রায়দের বাগাল। পদাই ভোলার চেয়ে ছোট। রোগা চেহারা, প্রায় রোগে ভোগে। বিল্টু সবার চেয়ে ছোট, চালাকচতুর। স্কুলে পড়ছিল। গত বছর বাগালিতে নেমেছে। অটলকে এরা মান্য করে, তবে বন্ধুত্বের হাওয়াটাই ধরা থাকে অসমবয়সী মানুষটার সঙ্গে।

রোদের বেলায় ওরা চারজনে ডাঙার মাঝে হীড় নামে আয়তকার পুকুরটার পশ্চিমের চওড়া পাড়ের উপর অশ্বত্থগাছে ছায়ায় বসে আছে। গরুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, নজর রাখতে হচ্ছে।

অটল বলল, 'আমি গরুবাগালি ছেড়ে দিছি। ভিন্ন কাজ করব।'

ভোলা পদাই বিল্টু আজ আবার গোপালও এসেছে, এমন অসম্ভব ঘোষণায় পরস্পরের মুখ দেখে, শব্দ হারিয়ে ফেলে, চোখের পাতারা স্থির অটলকে তারা

চেনে, মিথ্যে বলে না, কথাটার গুরুত্বের যথেষ্ট টানও রয়েছে।

অটল কারও দিকে না তাকিয়ে বলে যায়, 'মুনীল বাগালি করে চিরকাল ত চলবেক নাই—বয়স হয়েছে। তোরা ছোট ছেলে, তোদের এসব সাজে। বল্ আর কেউ বাগালি করছে বুড়োবয়সে, করে, মুনিষ না হয় কিষেন, না হয় মিস্ত্রি না হয় এ-দোকানে সে-দোকানে কাজ—তোরাই বল্।'

ভোলা বলল, 'কিন্তুক কী কাজ করবে তুমি? চাষ! কে জমি দিবে? দোকান?'

'তা জানি না।'

ভোলা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'তা জান না, আর কাজ ছেড়ে দেবে। গাঁয়ে থাকবে ত, না গোপীকাকার পারা চলে যাবে?'

গোপী বেনাচিতিতে দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল, সম্প্রতি পুরো পরিবার নিয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরে ঢের পয়সা, ঢের সুখ, কাজের অভাব নেই, সংবাদটা গাঁয়ে প্রচার করায় সবার মনে ছায়া ফেলেছে।

অটল বলল, 'আমি গাঁ ছাড়ছি না। যাব কুথা?'

'গেলে চলবে? গ্যাংটিপালের গরু কে চরাবে? একটু গরুর লেগে ত লুকে বাগাল রাখবে না কাউকে!' পদাই এমন করে বলে অটলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বৃত্তিত্যাগের মূল সমস্যা এটাই।

ভোলা অসহিষ্ণু গলাতে বলে, 'তুমি কী করবে বল দেখি।'

'ভিন্ন কাজ। বললম ত। জগা বলেছে কাজের ব্যবস্থা করবে।'

'ডাকাত জগা! তুমি ওর দলে যাবে? ডাকাতি করবে?' আতঙ্কিত স্বরপাতে গলা কাঁপে বিল্টুর। বলে, 'এই ভোলা অটলকা কী বলছে রে!'

ভোলা কী বলে! সেও তো অবাক। আচমকা আছাড় খাওয়ার আঘাতে বিহ্বল। ফ্যালফ্যাল চোখে সব তাকিয়ে থাকে।

অটল বিরত গলায় বলে, 'তোরা যে কী—ডাকাতি করব কেনে!'

'ডাকাতি করবে না ত ও শালার সঙ্গে করবে কী? ডাকাতির মাল বিচতে যাবে? তোমার হল কী বল দেখিনি!'

পদাই বলল, 'ও শালার কাছে যেও না, তোমার সব্বনাশ হয়ে যাবে। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে—জেল খাটতে হবে। এ হে, তুমি কত ভাল লুক—। তুমি—।'

অটল বলে, 'তোরা কী বল্ দেখিনি। জগা কাজ দেব বলেছে, ডাকাতি করতে বলে নাই। দেখি কী দেয়। ডাকাত না হয় হয়েছে, কিন্তু মানুষ ত বটে—দেখ উকে বাঁচিন দিলম্—আমি কী বাঁচিন দিয়েছি, হয়ে গেল, তার লেগে আমার উপকার

করতে চাইছে। মন আছে বলেই ত। সবাই উকে ডরায়, ঘিন্নে করে, আমি করব না। উর উপকারই করব। মতলব করেছি ভালমানুষ করব।'

'উর সঙ্গে মিশে তুমিও ডাকাত হয়ে যাবে?'

'না জগাই ভালমানুষ হবে?'

'হবে না। হবে না।' তিনটি কিশোরই গলা মেলায়।

'বাজী রাখ।'

ভোলা বলল, 'বাজী। বল কী বাজী।'

'দশ টাকা।'

'না, আমরা চারজনে দশ করে চল্লিশ টাকা দুব। তুমিও চল্লিশ দিবে।'

'ঠিক আছে।'

'তাহালে ওই কথাই রইল। লাও, তিন সত্যি কর।'

তিন সত্যি কাড়া হয়। তারপরই নীরবতা। আবহাওয়া বদলে গেল। দিব্যি রোদবেলায় নানা মজা হয়। পঞ্চরসের গান ধরে পদাই, 'শুন গো ও মাধবী তুমি কী আমার হবে' কিংবা 'নিঝুম সন্ধ্যায়', গালগল্প হয়, তর্ক কিংবা কোন নতুন খবর— এখন কিছু থাকে না। রুখুশুখু উঁচু ভুঁইয়ে যে আগেয় বাতাস বয়ে যাচ্ছে, হাঁড়ের পাড়ে গাছে যার শব্দ, অশ্বত্থের পাতায় যার কাঁপুনি, তার উর্ধ্বে একটা ডাহুক বিলম্বিত লয়ে ওধারের মহুয়ার পাতার আড়ালে ডেকে চলেছে।

অটল কিছুক্ষণ পর বলল, 'মরতে মরতে বেঁচেছে, ঢেক বদরক্ত বেরিয়ে গেইছে। বুঝলি—।'

কেউ কোন উত্তর দিল না।



শিবপুরে বৃহস্পতিবারের হাটে জগা নিশিকান্তর চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে। দাঁড়িয়ে ধীরে, ফনে, আর একজন অচেনা লোক। তিনটে সাইকেল স্ট্যান্ড-করা। অটল এসেছে বামুন ঠাকরুণের হাট করতে। অনাদি চক্রবর্তীর বিধবা। বাড়িতে পুরুষ নেই। ছেলে চণ্ডীদাস নিরুদ্দেশ হয়েছে। অটলের হাট লাগে না। দিদি আলুতে চলে যায়। বাগদীপাড়ায় হীরুর দোকানে চাল, তেল, নুন থেকে আলু, বেগুন সবই মেলে। মেলে বললে হবে না, কম পয়সাতেও পাওয়া যায়। আধখানা বেগুন কী পাঁচটা দেশালাইয়ের কাঠি কী একটা পেঁয়াজ। ঠাকরুণের ঘরে চা রুটি খেয়েছে। একটা টাকাও দেবে। ঝটপট হাট সেরে ফেলেছে। ফর্দ তো কম নয়। হাতের ব্যাগের পেট ফুলে গিয়েছে। দু' হাতে দুটো হাটের ভিড়, ব্যাপারীদের হাঁকডাক, কথা, স্কুলের মাঠে রোদের সকাল সরগরম। মস্ত হাট নয়, এক চিলতে, মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ ব্যাপারী, শতখানেক দেড়শ খদ্দের। ঘরে উৎপাদন শাক কি অন্য আনাজ নিয়েও বসে যায় অনেকে, বসেছেও।

দু' হাতে ব্যাগ নিয়ে হাট চত্বর ছাড়বে, জগার ডাক, 'ও অটলদা হাট হল?'

'হ্যাঁ।' অটল হাসে, 'বসে আছিস।'

'এস চা খাও। নিমে স্পেশাল চা, দুটো বিস্কুট দে।'

অটল মাথা নাড়া দেয়, 'আমি চা খাব না। খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ব্যাগ দুটো রেখে বস দেখি। তাহলে চিন্তা-ভাবনা করলে কিছু?'

অটল ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়েই থাকে, 'কিসের?'

'কী আশ্চর্য! তোমাকে বলে এলম কাজকম্ম দুব।'

অটল বলতে চায়, কাজকম্ম কী! চুরিডাকাতিতে ত থাকব না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সহদেবমাস্টার সাইকেল ধরে দেখছে তাকে। ওদিকে ভুতো আর পরানের চোখ আরও চোখ দেখছে, হিসেব করছে, সন্দেহ করছে। গা ঘামা বাড়ে অটলের।

'তুমি ত ভাল শণের দড়ি পাকাতে পার। ধীরে তোমাকে শণ দিয়ে আসবে। দড়ি পাকিয়ে দেবে অবসরে। খাটনির দাম খারাপ পাবে না।'

কাজটা অটল বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে। শণের দড়ি, দড়া পাকানো,

খাটিয়া বোনা, মাছ ধরার চাবজাল বোনা, ছিপ তৈরী করা, মাছ ধরার চার বানাতে পিঁপড়ের ডিম থেকে কেঁচো কী ভেতো মদের ভাত সংগ্রহ, পাকানো, কুড়ুল কাটারি-দা-কাস্তের বাঁট বানানো, ত্রিপল, চটের বস্তার সূচার্ সেলাই সে চমৎকার করে এবং বড়ই আনন্দের সঙ্গে। উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'পাঠিয়ে দিস্—করে দুব।'

'গামছা কিনেছ?'

'না।'

'টাকা পেলে কিনবে—কেমন?'

'হ্যাঁ, কিনব। তাহালে চলি, ঢেক কাজ আছে।'

নিশিকান্তর ময়লা লুঙ্গির উপর সামান্য ভুঁড়ি, ঘেমো কালো গাল ফোলা ভারী মুখ। চায়ের গ্লাস বাড়িয়ে ধরে বলে, 'লাও।'

অটলের দু' হাতে ব্যাগ। মাথা নাড়া দেয়। বলে, 'খাব না ত বললম।'

জগা আর অনুরোধ করে না। নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। যেন গাঁয়ের পরিচিত মানুষ নয়, অন্য কাউকে দেখছে। এমন আজব জীব চকাতে আছে এ বুঝি ধারণাতীত। তাচ্ছিল্য করতে পারছে না। মাথার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। ভালই কেটেছিল। সেলাই পড়েছে। দাগ থাকবে না। চুলে ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু এই অটলদা—এই মানুষটা!

অটল আর দাঁড়ায় না - হাঁটা দেয়।

সাত কেজি ওজনের মত শণের দশটা গাঁট দিয়ে যায় ফনে। বলে, 'তাগাদা নাই। অবসরে করবে। কুড়ি টাকা ধর। বাকী কাজ হলে—।' অটল নেয়, শণ কাটে। কিন্তু ওতেই কাজ শেষ হয় না। জগা জাল বিস্তৃত করে। সে কাজের তরঙ্গ লাগিয়ে দেয়, যাও মাংস নিয়ে এস শিবপুর থেকে, মোড়ল গাঁয়ে গিয়ে গাওয়া ঘি আন, দিদির গম ভাঙিয়ে এনে দাও শিবপুর থেকে, ছিপ তৈরী কর, খাটিয়া-বুন—। তরঙ্গে ভাসমানতায় অটলের সময় চুরি হয়ে যায়, টাকা আসে। বাগালি করে যাচ্ছে অবশ্য। জগা উঁচু দাঁত দেখিয়ে হাসে, 'হুঁ হুঁ বাবা বলতে পারবে না এমনি এমনি তোমাকে দান করছি। খাটছ—পয়সা লিছ। এতে কারও কিছু বলবার নাই।'

কিন্তু জগা বলেই লোকের কথা বলার ঢের জায়গা থেকে যায়। এতদিন অবসরে সে লোকের ছুটকো কাজ করে দিত। কারও জন্যে হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দেওয়া, কারও হাট করে দেওয়া কি কাঠ চ্যালা করা কি কয়লা বয়ে আনা, ধানের বস্তা নিয়ে যাওয়া—এই সব ছুটকো কাজ আর কী! এসবের জন্যে পারিশ্রমিক যে

সব সময় পেত, তা নয়—তাতে কী—সে করত। এখন সময় কোথা! তো সময়টা অটলের যাচ্ছে কোথায়, এ তল্লাশ লোককে করতেই হয়।

গরু চরাতে গিয়ে মাঠের দুপুরে ভোলা বলে, 'খুব ভাবসাব হয়েছে জগার সঙ্গে। খুব কাজ করছ উর।' যোগ দেয় পদাই বিষ্টু ওই কথায়। অটল বলে, 'তা করছি! দেখবি, জগা ভাল হয়ে যাবে, ডাকাত থাকবে না। বাজী রেখেছি মনে রাখিস।' ওরা বলে, 'তুমিই ডাকাত হবে সঙ্গদোষে—সবাই বলছে।' বামুন ঠাকরুণও বলে, 'ডাকাত ছোর স্যাঙাত হয়েছে শুনলম। কী সব্বনেশে কথা রে।' অটল ভয়কাতর ঠাকরুণকে আশ্বস্ত করে, 'স্যাঙাত কেনে হবে! বুঝলে, জগা লুক খারাপ লয়। কপাল দোষে অমনটি হয়েছে। দেখো উ ভাল।হয়ে যাবে!' ঠাকরুণ আক্ষেপুক্তের মধ্যেই বলে, 'জানি না বাবু। শোনার পর তোকে দেখেও ডর লাগছে।' অটল বলে, 'কী যে বল ঠাকরুণ, আমি অটল—অটলই আছি—থাকবও।' সহদেবমাস্টার, 'শোন, শুনে যা' করে লম্বা হাত বাড়িয়ে ডেকে বলে, 'এই যে শেষমেশ জগার দলে ঢুকলি বাবা—আর জায়গা পেলি না।' অটল বিব্রত গলায়, 'দলে ঢুকব কেনে, ওর কাজকম্ম করছি', বলা সত্ত্বেও সহদেব বলে, 'ওই হল, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, পুলিশের হুড়ো খেলেই টের পাবি। বুঝতে পারছি ওই বেধবা মাগীর জন্যে, ডলি নাম বটে লয়, টাকা খুঁজছে ত। আহা মুখ নামাচ্ছিস কী! লাজের কী বটে। মেয়েমানুষের লেগে বেটাছেলে রাজত্বি ছেড়ে দেয়, তুই ত ভাল মানুষি ছাড়ছিস।'

ডলি তাকে দেখেও দেখে না, সামনা-সামনি হতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কথা বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে আরও তো সবাই অটলকে, জগা স্পর্শ তাকে নষ্ট করতে চলেছে। কেমন করে সে বোঝায় ওর কাজ করে দেওয়া, পয়সা নেওয়া, কিছু কিছু কথাবার্তার মধ্যে টের পেয়েছে, জগা মানুষ, এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। কেমন করে বোঝায়, না মিশলে বদলানো যাবে না, তার দেনার টাকাটা জোগাড় হয়ে গেলেই সে জগাকে নিয়ে পড়বে, পথ থেকে ফেরাবে, বুঝিয়ে দেবে সহস্রচক্ষু ধর্ম মাথার উপর থেকে সব দেখছেন। শেষ বিচারের দিন জাবদা খাতা খুলে তিনি পড়ে নেবেন, তারপর শাস্তির নির্দেশ। এখন পায়ের নিচে অগ্নিকুণ্ড, বিষধর সাপের ফণা, বিছের বিছানায় শোয়া, তপ্ত তেলের কড়াইয়ে টগবগিয়ে ফোটা। জগা বুঝবে। ধম্ম আছেই। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দিতে পারে অটল। ঢের ঢের আছে তার অভিজ্ঞতায়। জগা তার দিকে চলেছে, দেখা কম করে ফনে ধীরেকে দিয়ে কাজ পাঠায়, তবে তার ব্যবস্থাও সে করবে। কাছে ঘন ঘন এলে সে বোঝাবে! সময়ের দরকার।

অটলের এ ব্যাপারে কোন ছেলেমানুষি নেই। ধর্মে আস্থাশীল জীবনধারা পদক্ষেপকে সংযত, ঋজু, সাহসী করেছে। ধর্মকে সে দেখেনি। ধর্মরাজ ঠাকুর তো গাঁয়েই, বৈশাখী পূর্ণিমায় পুজো হয়, তেল সিঁদুরে মাখা বাবার শিলাখণ্ড, মূর্তিও হতে পারে, সব চাপা পড়েছে তেল সিঁদুরে, ঠাওর করা যায় না। বাবার পুজোয় সে উপোস করে, নতুন ধুতি আর নতুন গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় করে আনে অন্য ভক্ত্যাদের সঙ্গে ভাঁড়ার। মাটির ক্ষুদে কলসীতে মদ। বাবা বাণেশ্বরকে নিয়ে ঘোরে। এই ধর্মঠাকুরের দিকে কত সময়ই একা অপলকে তাকিয়ে থেকেছে। না, তিনি বেরিয়ে আসেননি। তবে কর্মে অটল প্রত্যক্ষ করেছে।

গোপালপুরের উপরবাঁধে চক্রবর্তীদের সঙ্গে ঘোষেদের মারামারির সময় সে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছিল লাঠি চলতে, রক্তপাত হতে, তারপর থানা পুলিশ। নাদু চক্রবর্তী বলেছিল, 'তুই আমাদের হয়ে সাক্ষী দিবি। পুষিয়ে দেব তোকে। গোবিন্দর মাথা ফেটেছে। লাঠি ছিল বলাইয়ের হাতে। বলবি।' কিন্তু গোবিন্দরও তো লাঠি ছিল। সে তো হাত ভেঙে দিয়েছে পরেশের। সে কথা বলতে নাদু চক্রবর্তীর টেকো মাথা চাপা নাকের মুখে ঢুকে থাকা চোখ বড় বড় হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'তুই আমাদের পক্ষের সাক্ষী। তোকে ও কথা বলতে হবে না।' অটলের সবিনীত উত্তর ছিল, 'সত্যি ত বলতে হবে, এজ্ঞে ধম্ম বলে একট কথা যে রইছে।' নাদু চক্রবর্তীর ছোটখাট শরীরটার ভেতর থেকে বাঘের গর্জন এসেছিল, 'ধম্ম আবার কী রে! ধর্মটা কী!' চক্রবর্তী পুজো-আচ্চা করে, ঘরে নিত্য নারায়ণ সেবা, তার মত 'ছোটলোক' ছুঁয়ে ফেললে স্নান করে, কত শাস্ত্র পড়ে, কত মন্তর জানে, ঠাকুর দেবতার কত কাছের লোক—অটল তাকে কী করে ধর্ম বোঝায়। তবে বুঝেছিল বৈ কী। তাকে সাক্ষী মানেনি। বলেছিল, তোকে সাক্ষী করলে মরতে হবে। দরকার নাই। অটল টের পেয়েছিল, ভয় পেয়েছে চক্রবর্তী। তো ভয় কী তাকে? ভয় তো ধর্মকে। গরু খুলতে ভজন সাহার ঘরে রোজ যায়। ওদের একটা কাঁসার থালা চুরি গেল। উঠোনে পড়েছিল। ভজনের ভাগনে এসেছিল। সে বলে কী না, 'এই লোকটা তো গরু খুলতে এসেছিল. আর কেউ আসে নাই।' ভজনের বৌ শুনে হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'কাকে কী বলছিস্, ও করবে চুরি!' তার দিকে ফিরে বলেছিল, 'কিছু মনে করো না তুমি।' কী সম্ভ্রম ঠাকরুণের। সে তো অটলকে নয়—ধর্মকে। নুটুগেরস্ত প্রায়ই বলে, 'কম্ম দোষে ছোটলোক ঘরে জন্ম, তুই তো বামুনের উপর।' সেও তো অটলকে নয়, তার ধর্মকে সম্ভ্রম। আরও আছে। অটল লম্বা ফিরিস্তি ফেলতে পারে। চিনি তার বৌ মাঝেমধ্যে রাগ করত বটে, তবে বলত, 'ওমা

তোমাকে অবিশ্বেস, বলি কে করবে—দুনিয়াতে এমন মানুষ আছে?' চিনি তার আরতে চোখ তুলে রাখত। কী অপরূপ মুদ্রাই না গড়ে উঠত। চিনি অবাক মানত, 'কী করে যে তুমি থাক—রাগ নাই, রোষ নাই, সকলিতে সন্তুষ্টি। কারও জিনিসে হাত দিবে না, কাউকে মন্দ কথা বলবে না, চুরি বাটপাড়িতে থাকবে না, শুধুমুদু লোকের উপকার করবে—না বাবু তুমি কারও পারা লও। জান চকার গোপালপুরের সব বলে, অতুলের পারা মানুষ হয় না। এ মা, সোয়ামীর নাম করে ফেললাম।' জিভ কাটত। স্বামীর নাম করা উচিত নয়—কিন্তু চিনি যে কতবার নাম করত, কতবার জিভ কেটে লজ্জিত হত তার ঠিকঠিকানা নাই। বলত, 'লোকে ঠিক বলে, তুমি একদম ছোটছেলে। ছোটই বটে। এতটুকুন! এতটুকুন!'

চিনুর ওই সুখ—এ তো ধর্মের দান। অতুলের এ সব ভাবনায় আত্মিক জোর আসে। সে জানে, ধর্ম প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসম্ভবকে সম্ভব করে।

সন্ধেবেলায় মন খারাপ নিয়ে জগা আসে অতুলের ঘরে। দু' চারদিন ছাড়া ছাড়া ঝড়জল হয়ে যাচ্ছে। জলের চেয়ে ঝড়ই বেশি। ফলে তাপে আবার ধরিত্রী গ্রীষ্ম পরিমণ্ডলে। কিন্তু এই যে বৃষ্টি, এতে চাষের গুনগুনানি শোনা যাচ্ছে। বীজতলা প্রস্তুতে লাঙল পড়ছে কিছু জমিতে। পচা খড় আর গোবর সার যাচ্ছে গরুর গাড়িতে, পড়ছে ক্ষেতের মাটিতে। চাষ আসা মানে কাজ আসা। আজ বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, দিনজুড়ে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র। তাপ খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবছায়াও বমন করছে, গা-জ্বালানি উষ্ণতা। বাতাসের বড়ই মৃদু বীজন।

জগার পাজামার উপর হলুদ গেঞ্জি, শক্ত উঁচু কলার, গলায় একটা সরু সুতো রুপোর হার, হাতে বালা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। সে ঘোষালপাড়ার বিষ্টু ঘোষালের ঘরে ডাকাতির কেসে ফেঁসেছে। ফেঁসেছে মানে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাদিপুরের কেষ্ট হাড়ীর গ্যাংয়ের কীর্তি ওটা। বুধন ধরা পড়ে তার নাম করে দিয়েছে। কেষ্টর এটা শেখানো। রসপুর থানার বড়বাবু সব শুনেও খবর পাঠিয়েছে, হাজতে পুরতে পারি, সরে থাক্—তিনশ টাকা দিয়ে যা। জগাকে টাকাটা দিতে হল। ঘরে দিদির সঙ্গে টাকা নিয়ে ঝগড়া। হাত তার ঢুঁ ঢুঁ। মোষ চুরির টাকা খতম, মাথা ফাটানো। লখনার উপর শোধ নেওয়ার সুযোগ হয়নি। ফনের আবার দু'শো টাকা দরকার। দিতে হবে। থানিদার অর্থাৎ তার চোরাই মালের ক্রেতা ভুজঙ্গ সাহা হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে। সিগারেট দিয়ে বলল, 'মাথা ফাটাতেই কাৎ হয়ে গেলি। ছেড়ে দিলি নাকি কাজ কারবার।' শুনে তাড়না মাথায় টিকির

টিকির করছে, 'জগা জয় মা বলে নিশিকালে ঝাঁপা বাপ'। অন্যদিকে নিষেধ, 'ঘোষালপাড়ায় সবে ডাকাতি হল, হাওয়া গরম, ঠান্ডা দরকার, পর পর কেস হলে উপরের টনক নড়বে, দারোগা বাপও বাঁচাতে পারবে না উপরের হুড়োয়, পুরে ফেলবে। তারপর কেস, আদালত, জেল। ধৈর্য ধর চাঁদু!'

এ সবকিছুর তালগোল পাকান অনুভূতির বিপর্যস্ততায় জগা যেন ভর দুপুরের প্রখর রোদে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে। ঢের রক্ত নির্গত হয়েছে, শরীরের দুর্বলতা কাটছে না। এদিকে উল্টে জ্বালার একটা আস্তরণ পাতলা থেকে শক্ত হচ্ছে। অটলের কাছে আসার ইচ্ছেটার মধ্যে সে টের পেয়েছে খানিকটা আরাম অনুভব করবে। মানুষটার আকর্ষণ শক্তি আছে। এর কোন ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না। অটলের কথা, চাউনি, হাসি, লোভহীনতা, নীতিবোধ, সরলতা যেন আলো ছড়িয়ে রাখে। কী চমৎকার আলো! তার সঙ্গে জ্বলা চোখ স্নিগ্ধ হয়, মস্তিষ্ক কোষের উত্তাপ প্রশমিত হয়ে আসে।

এখন অটলের ঘরের মাটির নিচু দাওয়ায় বসেও সেটা টের পায়। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'কি অটলদা রাঁধছ! আমাকেও ভাত দিবে নাকি?'

'খাবি?'

'দিলেই খাই। দাঁড়াও, তোমাকে চাল আলু এনে দি। দুটো ডিমও আনি।'

'খাবি বলছিস্—খাবি। অত কিসের! কিছু লাগবে না।'

'তাই হয় নাকি!' জগা উঠতে চায়।

অটল বলে, 'বস্ দেখিনি। ও সব আনলে ভাত দিতে পারব না। আলু এনেছি, একডুং ডিংলে আছে। পোস্ত করব। আর কলাইয়ের ডাল। রুচবে?'

'খুব। কিন্তু তোমার খরচা—।'

'কী ভাবছিস্—তোকে ভাত দিলে গরীব হয়ে যাব।'

জগা মজা করে বলে, 'বড়লোক বট তুমি।'

'বাটিই তো দিব্যি চলে যেছে। কেবল ওই ছিদেমের দেনা রইছে—এই যা।'

'ছিদেমকার টাকা তাহলে তুমি দিবে। মরা মানুষের দেনা যে কে শোধ করে!'

অটলের উনুন ধরানো হয়েছে। এ্যালুমিনিয়ামের ছোট ত্যাবড়ানো কালিপড়া হাঁড়ি। চাল ছাড়ে বাটির জলে ধুয়ে। কাঠের আগুন, জ্বললেও ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে। বলে, 'বিড়ি কলাইয়ের ডাল খেতে ভাল বটে, কিন্তু সিজতে ঢেক কাঠ পুড়ে, আমি ত আধসিজেই নামাই।'

জগা কোন উত্তর দেয় না। দাওয়ায় বসে দেখে সন্ধের আঁধার ক্রমে ঘন হয়ে

উঠল। একটা টর্চ হেঁটে গেল ওদিকে। গাঁয়ের নিশিঝিম্‌্নি শব্দ হয়ে গিয়েছে। শব্দ নেই, চলাচল নেই।

'অটলদা সবাই আমাকে ডরায়। তুমি ডরাও না?'

'ডরের কী আছে। তুকে মায়া লাগে! শুন জগা, ভগবান হাত পা, গায়ে খেমতা দিয়েছে কিসের গেলে—না, খেটেখুটে খাও। দুনিয়াতে ঢেক কাজ। লুকের কেড়ে-কুড়ে খেলে অধম্ম হয়, লুকে ঘিন্নে করে, অভিশাপ দেয়। মানুষকে কাঁদালে নিজেকে কাঁদতে হয়। অভিশাপে বিষ থাকে। জেবনে মরণে সেই বিষে পুড়তে হয়।'

'অভিশাপ আবার কী! দুনিয়াতে কোন শালা সাচ্চা? সব ধান্দাবাজ! কেউ কারো দুখ দেখে না, কষ্ট বোঝে না, মায়া নাই। সব মানুষই সবাইকে কাঁদায়!

'যার যেমন চোখ! খারাপ মানুষ ঢেক আছে। তা বলে নিজেকেও খারাপ হতে হবে। ধম্ম নাই?'

অসহিষ্ণু তার বক্রমুখে জগা বলে, 'তুমি যে কী ধম্ম ধম্ম কর। ধম্মকে বগলে নিয়ে ত ঘুরছ! কী হয়েছে? এ বয়সেও গরুবাগালি। বৌদির চিকিচ্ছে করতে পারলে না। হাত পুড়িয়ে খেছ। দেনদার হয়ে আছ একজনের কাছে। ঘরের ত এই হাল তোমার।'

অটল গায়ে মাখে না। বলে, 'জগা এসব খারাপ কাজ ছেড়ে দে।'

'ছেড়ে দিয়ে কী বুড়ো আঙুল চুষব?' জগা উত্তেজনায় ঝাঁকড়া চুলের মাথা নাড়া দেয়, 'তোমার কাছে মাথা ঠাণ্ডা করতে এলম, গরম করে দিছ—আমি চললুম।'

'বস্। তোর জন্যে ভাতের চাল নিয়েছি।'

'আমি খাব না।'

অটল বলে, 'না খেলে আর কী করব। খাবি বললি, এখন না খেয়ে আমাকে অধম্ম করাস্ না। তুই আমার অতিথ।'

'আবার সেই অধম্ম ধম্ম।' জগা মাথা নাড়া দেয়, 'ধম্ম না ছাই। বুঝলে এ তোমার ডর। বল নাই। আমার বল আছে, ডর নাই, তাই ধম্মও নাই। তোমার ভাল করার লেগে মরছি। আর তুমি ডরে শামুকের পারা গুটিয়ে থাকছ।'

'আমিও তোর ভাল করতে চাই।'

জগা এবার শব্দ করে হাসে, 'লাও ঠ্যালা, কারট ঠিক কে বলে দেবে।'

কথার মধ্যে উঠোনের অন্ধকার ভেঙে ওপাশ থেকে ধীরে আসে। লম্ফের লালচে শিখা পড়ে তার উপর। লম্বাটে মুখের কপালে চওড়া কাটা দাগ, মাথায় কোঁকড়ানো

চুল, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, কোমরে বাটিক প্রিন্ট সবুজ লুঙ্গি। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'বসে রইছিস এখানে—ওদিকে বড়বাবু নীলুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, রাতে চকা রেড করবে। সরে থাকতে বলেছে। উপরের চাপ পড়েছে ঘোষালপাড়া কেসে।'

'শালা ফালতু ঝামেলা।'

'বড়বাবু আবার দু'শো টাকা চেয়েছে।'

'শালা, ডাকাত।'

ধীরে অটলকে দেখে নেয়। হাত বাড়ায়, 'সিগারেট দে তো!' জগার বাড়ানো সিগারেটটা নিয়ে লম্ফে ধরিয়ে পাশে বসে।

'টাকা এখন কোথা পাব?'

'জানি না।' ধীরে সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়ে, 'সবাইকে খবর দিয়েছি। সরে থাকবে আমাদের দলের সবাই।'

'বড়বাবু মহা হারামী।'

'শুয়োরের পারা লয়। শুয়োরের বাচ্চা যেতে শান্তি। মেজবাবুও নাকি চলে যাবে।'

'আর একটা উর বদলি আসবে। হাত সেই এক থাকবে।'

'কিন্তু কত বসে থাকবি। কিছু ত করতে হয়। একবার যাবি গোঁসাইয়ের কাছে—ভালমন্দ দেখিয়ে আসবি?'

গোঁসাই রক্তবস্ত্রে, কপালে সিঁদুরের গোল সূর্যটিপে, রক্তচন্দনের ছোপ লোমশ বুক-বাহু কাঁধ কণ্ঠে, ঘাড় বরাবর কাঁচাপাকা চুলে, দাড়ি গোঁফের ঠোঁট ঢাকা দীর্ঘতায়, পাটল বুকে, গমগমে কণ্ঠস্বরে যথার্থই রহস্যময়তার কারবারী। ঝাড়ফুঁক, বিষ নামানো, কবচ, তাবিজ, ক্রিয়াকরণ, গণনা, ভবিষ্যৎ বাণী ইত্যাদি নিয়ে অদৃশ্য অশুভ শক্তির ক্রিয়াকাণ্ড ব্যক্ত করতে পারে, নির্দেশ দেয়। গাঁজায় বুঁদ হয়ে থাকা ঢুলুঢুলু চোখে বলে, আমি কে বটি হে, তেনারা যা বলেন তাই বলি। জগাকে বড়ই স্নেহ। খড়ি পেতে শুভ সময় জানায়, সাবধান করে। মদ মাংস নিয়ে প্রায় সময়ই তারা দুজনে বসে। গোঁসাই সংসার করেনি। শিবপুরের দক্ষিণে বড় পুকুরের ধারে মাটির চালাঘর, ত্রিশূল পোঁতা মা কালীর বেদী। ঘরে আছে বাসিনী বাউরি। সেই সব করে, মধ্যবয়স্কা নিঃসন্তানা নারী গোঁসাইয়ের রক্ষিতা।

'ও তো বলেছে ভাল সময়। শালা, তাহলে খারাপ সময় যে কাকে বলে।' জগা আলগা গলায় কথাটা বলে ক্ষীণ নীরবতা রেখে প্রশ্ন করে, 'লখনা, বাগ্দী ছোঁড়া দুটো নিয়ে ঘুরছে?'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝেছে, একা হলেই তুই ছাড়বি না। বলি কী—।' ধীরে একবার পিছন এবং আশপাশের অন্ধকার দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলে, 'শালাকে না মেরে উর ঘর মারতে চল্। বলিস্ ত ব্যওস্থা করি।'

'জেলে ঢুকবার সাধ হয়েছে?'

'এ বাইরে মরার চেয়ে জেলে বেঁচে থাকা ভাল।'

'জানিস্ না তো জেলের সুখ।'

'তুই তো একবারই বহরমপুরে দেখেছিস্। তাও ছ'মাসের লেগে।'

ভগা ও কথার দিকে যায় না। বলে, 'ধীরে তুই সরে পড়। শিবপুরেই চলে যা তুই। ভুবনের ঘরে থাক গা।'

'কিন্তু টাকার ব্যবস্থা না হলে! এ রকম চলবে নাকি?'

'কাল শুনতে পাবি। সকালে শিবপুর মোড়ে আয়।'

'তুই কোথা যাবি?'

'দেখি। ও অটলদা হল তোমার ভাত?'

'তুই এখানে খাবি!'

'হ্যাঁ। অটলদার কাছে নিমন্তন্ন নিলম।'

ধীরে কৌতুকের গলায় বলল, 'ও অটলদা আমার নিমন্তন্ন হবে না?'

'হবে। বস্। নিমন্তন্ন তুরও। খা কেনে!'

ধীরে বলল, 'অটলদা মাইরি বাগাল ছোঁড়াই থেকে গেল।'

'চুপ মার। চলে যা।'

'দে আর একটা সিগারেট।' ধীরে হাত বাড়ায়। সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।

অটল বলল, 'অধম্ম শান্তি দেয় না। বুঝ, ঘরে শুতে পাবি না শান্তিতে। কখন পুলিশ আসবে ভেবে ঘুমও হবে না।'

'তোমার ভাত হল!'

'এই হয়ে এল। ইবার আলুপস্ত করব। খিদে লেগেছে?'

'না। তাড়াতাড়ি আছে। কেনে যে তোমার হাতে খেতে মন হল। এমন কথা বলছ পিত্তি জ্বলে যেছে। উঠে যেতেও পারছি না, তোমার অধম্ম হবে নাকি! আমি উসব মানি না, তুমি মান—কেনে তোমাকে কষ্ট দিই।'

'আমার লেগে তাহলে ভাবনা তোর হয়েছে!'

'হ্যাঁ, ফাঁসিয়ে দিয়েছ তুমি আমাকে!'

'তুইও আমাকে ফাঁসিয়েছিস্ জগা !'

'আমি আবার কী ফাঁসালম ! আমার লেগে তুই ভাবিস্—আমি তোর লেগে ভাবব না ?' উনুনের দিক থেকে মুখ সরিয়ে অটল বলে, 'তুই কিন্তুক কথা রাখছিস্ না !'

জগা বলে, 'কথা রাখি নাই !'

'হ্যাঁ। লখনাকে মারার মতলব করছিস তোরা'!'

'ওটা আমাদের ব্যাপার ! তুমি কেনে মাথা ঢুকুচ্ছ বল দেখিনি। তোমার এত দরদ লাগছে কেনে ?'

'বাঃ লখনা মানুষ ত বটে। মানুষ মানুষকে মারবে কেনে ?

'মানুষই তো মানুষকে মারে, মানুষই মানুষের সর্বনাশ করে।'

'অধর্ম্ম। ওইটি চলবেক নাই।'

সুবিশাল শক্তিমানের আদেশ যেন ঝরে অটলের মুখে। জগা অবাক মানে। অন্ধকার চরাচরে প্রকম্পিত অমোঘধ্বনি গভীরতর বিশ্বাস থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জগার মাথায় পাক খেতে থাকে। সে ধ্বনিরহস্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। অনুভব করে তার শক্তি, বিশ্বাস দৃঢ়তা—জগার জীবনকে হাঁটানর জন্য প্রশস্ত করা বক্ষদেশ এবং পা জোড়া যেন অদৃশ্য মুগুরের আঘাতে ন্যুব্জ হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে অটলের খেতে ডাকায়, নিজেকে ফিরে পায়।

ওদিক কাঁদরে মাছ ধরছে। এক চিলতে জল। কাদা রঙে জল বলে চেনা দেয় না, কাদার ঘোল যেন। চকার উত্তরে এই কাঁদর বা খালটা বয়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ক্ষুদে ডোবার আকৃতি নিয়ে জল জমে থাকে। পোশেখ জষ্ঠিতেও খানিকটা জল কোন কোন ডোবাতে থেকে যায়। পুকুর ভেঙে, ক্ষেত ভাসিয়ে জল নামে কাঁদরে, পড়ে গিয়ে ক্ষুদে কুশকর্ণী নদীতে। ও ডোবাগুলোয় পুঁটি, মৌরলা, দাঁড়কে, মাগুর, চিমুরি, চ্যাং, কই ইত্যাদি মাছ থাকে। এগুলোর মালিক নেই, মাছচাষও কেউ করে না। বয়ে আসা জলের মাছ সব। ফলে যার খুশী ধরতে পারে।

অটলের বকনাটা সরকারী পশু চিকিৎসাকেন্দ্রের পুরিয়া খেয়ে দিব্য শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। রোগ নেই এখন, ঝিমিয়েও থাকে না। অটল নিজের পালে চরাতে না নিয়ে গিয়ে গাঁ বাইরে পুকুর গাবায় ছেড়ে দিয়ে যেত, এক জায়গাতেই ঘোরাঘুরি করে তৃণ সংগ্রহ করত বকনাটা। শক্তি আসতে এখন পুকুর গাবা ছেড়ে

অন্যদিকেও ছোটে। কাদরের দিকে চলে আসে। কাদরের গর্ভে জায়গায় জায়গায় গ্রীষ্মেও সবুজ ঘাসের চাবড়া মেলে। আজও এদিকে এসেছে। ভোলাদের হাতে গরু রেখে বকনাটাকে কাদরে দেখতে এসে তার চোখে পড়ে ডলিকে। একদিন ডলি সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, ঘনিষ্ঠতার তাপও বিকিরণ করেছিল, কিন্তু জগার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পর তো কোন কথা নেই, ফিরেও দেখে না।

ডলির হাঁটুর উপর বিবর্ণ সবুজ ছাপা শাড়ি কাদা মাখামাখি, বুকের আঁচল শক্ত করে জড়ানো। কাদার ছিটে মুখে গলায় বুকে। মাথার চুল বাঁধা। কাঁধের কাছে ঝুলছে পেটমোটা সরু মুখো বাঁশের 'খাড়োই', মাছ রাখে যাতে।

দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল অটল। কিন্তু তাকে আবার ঘাড় ঘোরাতে হয়। গলা, কাঁধ, বাহুমূলের নগ্ন চিক্কণতা, স্তনের বন্ধনভেদ, পেলব মাংসল তরঙ্গ, ঠোঁট চোখ এবং কাদাজলে দাঁড়ানর এক পা বাড়িয়ে কোমরের বাঁকে, নারীর রমণীয় ভঙ্গীটি আকর্ষণের ডানা ওড়ায়। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও পারে না।

'আমাকে দেখে এদিকে এলে!'

অটলের উত্তর সরাসরি অমন কথায় যেন জড়তায় এসে যায়। মুখভর্তি আঠা—মোট আঠা। ঠোঁট ফাঁক হয়ে একটা শব্দ বের হয় শুধু, বিকৃতির শব্দ।

'লাজের কী আছে! বেটাছেলে বট। মেয়েমানুষের টানে না এলে পুরুষ মানুষের দাম কী! ওরে বাবু, সাফ কথা বলি, চোর ছ্যাঁচোড়কে আমি ঘিন্নে করি।'

অটলের মুখেচোখে কাদার ঝাপটা লাগে। মোছার ভঙ্গীতে সে বলে, 'চোর ছ্যাঁচোড়! আমাকে বলছ!'

'আবার কাকে! মাঝিঘরে অমন ডাগর ডাগর জোড়া খাসি চুরি করলে!'

'আমি!'

'হ্যাঁ। জগার দল করেছে। তুমি ত ওই দলেই আছ।'

'না—আমি দলে নাই!'

'নাই বললে লোকে শুনবে কেনে! এখন স্যাঙাত হয়েছ। মদ মাংস সব খেছ ত উর সঙ্গে!'

'মদ!'

'হুঁ। মদ খেয়ে মাতাল হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, যা খুশী করা যায়। খাবে—কেমন!'

'আমি মদ খাই না।' অটলের যেন রাগ হয়ে যায়। বলে, 'জগা কাজ দেয়, আমি করে দিয়ে পয়সা লি। আর ডাকাত হলেও উ ত মানুষ বটে। ভাল করব উকে।

ভোলাদের সঙ্গে বাজি রেখেছি, জগাকে ভাল করব।'

ডলি শরীর দুলিয়ে হাসে, 'জগাকে ভাল করতে পারবে? উল্টে ডাকাত হবে।' বলে, 'তা আমার সঙ্গে কথা বল না।'

'তুমিই ত মুখ ঘুরিয়ে লাও। দেখেও দেখ না।'

ডলি দ্রুত গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'তাতে তোমার কষ্ট হয়?'

'কি বললে?'

'কিছু না। আমি সাঙা করছি—তা জান।'

অটল বোকা বোকা চোখে তাকায়। মেয়েমানুষের সেদিন তাকে হাঁস তুলে দিতে বলা, ঘরে ডাকা, শরীরের ভঙ্গী, কথা বুকের মধ্যে ঘুরপাক খেত, তারপর দেখেও না দেখা কষ্ট দিয়েছে। ডলির কথা ভাবতে শরীরে সে শিরশিরে অনুভূতি টের পায়, ঘুমন্ত এক সুখবোধ আড়মোড়া ভাঙে হৃৎপিণ্ডে,শিরাপথে পেশীতে পুরুষ ক্ষুধা এক পেলব অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত হয়। এখন তারই সাঙা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিয়ের কথা অতর্কিত আঘাত হানে। সে যুবতীকে দেখে। কখন যেন তারই হয়ে গিয়েছিল। মরে যাওয়া বৌ চিনির স্মৃতি থাকে না, তার শরীর গন্ধ থাকে না, তার স্বর্গ সুখের নিবিড়তা থাকে না। কিংবা মরেও যেন ডলিতে ফিরে এসেছিল চিনি, সেই নারী বহু দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে, তারই কষ্টবোধের মোচড় অনুভব করে সে।

'শুধুছ না কার সঙ্গে সাঙা হচ্ছে আমায়। ফনের সঙ্গে। বলবে কিছু!'

অটল সম্মোহিতের মত না বুঝেই না-সূচক মাথা নাড়া দেয়।

ডলি বলে, 'আমি কিন্তু বলতাম। তুমি যদি কাউকে সাঙা করবে বলতে তাহলে বলতাম, না করতে পাবে নাই। যদি বলতে কেনে, বলতাম, স্বার্থ আছে আমার। তুমি বলতে পার না? ডর কিসের? বল সাঙা করো না বলতে মন হচ্ছে না?'

ডলি সামান্য থেমে বলে, 'তোমার মুখ দেখব না, কথা বলব না ভেবেছিলাম। আমার কথা রাখ নাই। জগার সাঙাত হলে। কিন্তু ভাবলে কী হবে—থাকতেও পারছিলাম না। মন পুড়ছিল তোমার লেগে। কখন ঘরে আসবে আমার। না এলে আমিই ডেকে আনতাম। যাক্ কাঁদর ধারে ত আমার লেগে এলে।' ডলি হাসে। বলে, 'হাঁ করে খালি আমাকে দেখছ—কথা বল।'

'কি বলব!'

'ফনের সঙ্গে সাঙাতে আপত্তি না থাকলে কিছুই বলতে হবে না—চুপ মেরে থাক। চলে যাও এখান থেকে।'

'আমার বলার মনুরোদ কোথা ?'

'ঢের মনুরোদ আছে। নিজেকে তুমি জান না! খুব ত ধম্ম মান! একটা মেয়ে-মানুষকে বাঁচানো ধম্ম লয় ?

অটল উত্তর খুঁজে পায় না।

'সন্ধেবেলাতে আমার ঘরে আসতে পারবে ?'

'পারব।'

'আমি খাটতে পারি, ভাতের লেগে ভাতার লাগবে না আমার। যদি বল কিসের লেগে, বলব জানি না। তাহলে সন্ধেতে এসো। আরে হাঁ করে আমাকে দেখছ গরুর পারা। সাঁতার্সাতা গরু লও, পুরুষ বট। এখন যাও দেখি।'

ডলির কাছ থেকে সরে এলেও অটলের মনে নারীর ঘন ছায়া থেকেই যায়। কথা এবং শরীরের যুগ্মতায় তার কামনার মেঘ এখন জমে। অঝোর বৃষ্টিতে ভেঙে পড়তে চায়। সে সন্ধেবেলায় যাবে, চুপ করে থাকবে না, সে পুরুষ—ডলি অত কথা বলতে পারে, সে পারবে না। শুধু একটাই ব্যাপার জগাকে নিয়ে। তার যে ভাল করার দায়, ডলি মদত দেবে কি। ভুলে গিয়েছিল অটল, এখন মনে পড়ে ফনেকে দিয়ে খুন করানর মতলব আছে। ওমনি নারীর কামনা, ভালবাসার কথাগুচ্ছ, আঁচলের উষ্ণতা যেন ডানায় ভেসে যায়। ডলির সব মাধুর্য ঝরে যায় শুকো পাতার মত। দাঁড়িয়ে থাকে ডাল আর গুঁড়ি, যেন কঙ্কাল। অটল যে কী করে?

প্রশ্নটা মুছে যায় বকনাটাকে দেখে। বড় স্নেহের চোখে সে দেখে। ঠিক ঘাসের গন্ধে চলে এসেছে—যা ভেবেছিল। আহা, বেচারা খাক, ভেবে সে থমকে থাকে। আকাশ তকতকে। রোদের কড়া থাপ্পড় পড়ছে এখন গায়ে। কিন্তু গরুর জাত, মুখ লাগালে নড়তে চায় না। তারপর এমন নরম ঘাস কাঁদরের গর্ভে, ওদিকে বাবলা গাছের পর পর ছায়া। অটলকে আবার পালে যেতে হবে। বেলা পড়লে গরু ঢুকিয়ে দিতে হবে ঘরে ঘরে। এঘর সেঘরে অল্পস্বল্প কাজ থাকলে সন্ধে। বকনাটাকে গাঁয়ের মধ্যে পুকুরগাবায় রাখবে। পিঠে হাত রেখে হেট্ হেট করায় যেন ও বুঝে ফেলে, ঘুরে বিপরীতে হাঁটে, যাবে না। রোগ মুছতে তেজ দেখ!

বকনাটা ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় ধরল পদমিস্ত্রি। সাইকেলে বাঁধা লম্বা সাইজ করা কাঠ। থমকে বলল, 'তোমার সেই বকনাটা। মরে নাই?'

'মরলেই হল।' অটল বকনার পিঠে হাত রাখে, 'জল পড়লে খোলতাই কেমন হয় দেখবে।'

'কার ওষুধে ভাল হল ?'

'ডাকতারের। চারবার ওষুধ পড়ল। কি খাবুটেই না হয়েছে। চললে কোথা ?'

পদামিস্ত্রির অবাক চোখ বকনাটার উপর. 'মরাটকে বাঁচালে—।'

'আমি বাঁচানোর কে ? শিবের ধন।'

পদামিস্ত্রির যেন মনে পড়ে যায়। ঘেমো কালো মুখ, ছোট মাথা, পাজামার উপর কলার ছেঁড়া হাফশার্ট, রোগাটে চেহারা, ক্ষুদে চোখে আশপাশ দেখে নিয়ে বলে, 'ভাল কথা, আমি শুধুব ভাবছিলাম তোমাকে। দেখাই ত হয় না। তুমি জগার সঙ্গ নিয়েছ ? আমার ত বিশ্বেসই হয় না। বললাম, অটলের পারা ভাল মানুষ উ সবে থাকতেই পারে না।'

অটল বলল, 'থাকব কিসের লেগে : জগাই আসে আমার কাছে।'

'ওই যে বাঁচিয়েছ। বুঝলে পাত্তা দিও না। তোমার বদনাম হয়ে যেছে। চলি। রোদ যা বাড়ছে।' সাইকেল হাঁটিয়ে যায় পদামিস্ত্রি।

অটল বিরক্ত হয় না। এত লোকের কথা, ভোলাদের সঙ্গে বাজি রাখার জন্যে প্রায়ই ওদের কথা তোলা, খাসি দুটো চুরি করাতে, হেরে গেলে দাও টাকা, ডলির মন্তব্য, তার তীব্র টানুনিতে, আসক্তিতে বিচলিত হয়ে ওঠা—সবই যেন দাঁড় করিয়ে রেখে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। জগা ভাল হবেই এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চয়তাই এর কারণ।

লোকের ঘরে গরু ঢুকিয়ে বকনাটাকে পুকুরপাবা থেকে নিয়ে আসতে মরা গোধূলি। সান্ধ্য অবশতায় প্রকৃতির আমেজ এসেছে। আঁধার নয়, ধূসরতার ছায়া মাখামাখি। অটল দেখে, দাওয়ায় বসে আছে জগা। ওদিকে ঠ্যাং বাঁধা মুরগী।

'কতক্ষণ বসে আছি। এখানেই খাব। মুরগীটা খোঁড়, আনছে, কেটেকুটে দিয়ে যাবে। ঝোল আর ভাত লাগাও। সেদিন খেয়ে খুব তৃপ্তি হয়েছে।'

অটল বলল, 'রক্ষে কর্ জগা। আমি ওসবে নাই।'

'কেনে ?' কোঁচকানো ভ্রূ জগা বলে, 'মুরগীটা চুরি করা লয়। রামামুচির বৌয়ের কাছে নগদ বাইশ টাকা দিয়ে কিনেছি। শুধিয়ে এস।'

'মুরগী না হয় চুরি করিস্ নাই, মাঝিদের খাসি জোড়া ত চুরি করেছিস্।'

'আমি ছিলম নাই। ধীরে ফনে বাদলা ওরা সব। দেখছ ত পুলিশ ক্ষ্যাপা কুকুর। কিছু করা যেছে না। ওদের ত চালাতে হবে।'

'তার লেগে চুরি করতে হবে ? সব তো জোয়ান। খাটতে পারে না ?'

'খাটনি কোথা ? কে দেবে ! তোমাকে খাটিয়ে দু' পয়সা দুব ভেবেছিলাম

দেখছ ও কাজই দিতে পারছি না চাবগোল সোনার পর—। দুটো জালই পড়ে আছে। হাটে বিক্রি হয় নাই। খাটার মুনিষ ঢেক—খাটানিই নাই। তুমি ছাড়া এ পাশে সইচেই-বা কী!'

'পঞ্চায়েতের কত কাজ! পুকুর কাটা, রাস্তাতে মাটি দেওয়া, লোন দিচ্ছে কত!'

'এই জন্যেই নাগাল থেকে গেলে! ওসব কাজ ক' দিন।'

খাঁকি হাফ প্যান্ট, খালি গা, কোমরে গামছা বাঁধা খোঁড়া এসে দাঁড়াল, 'দাও বঁটি দাও। শালপাত আছে? কেটেকুটে রাখব কিসে?'

অটল বলল, 'মুরগীটি জগার দিদির ঘরে নিয়ে যা।'

'না। খোঁড়া বঁটি, পাত, জোগাড় করে কেটে আন। এখানেই আননি।'

খোঁড়া হাতে তুলে নিতে মুরগীটা দু'বার ডানা নেড়ে শব্দ করে।

অটল অসহায় গলায় বলল, 'আমি রাঁধতে পারব না। রাঁধলেও তোর রুচবে না!'

'খুব রুচবে। তেলমশলা সবই খোঁড়াকে দিয়ে আনা করাছি। আর শুন, তুমি রাঁধবে, কাঠ দিবে, খাটবে, তার দাম আছে। খাওয়াছি না, খেটে খাবে। জানি আমার পারা ডাকাতের রোজগারের ভাত মাংস তুমি এমনি এমনি খাবে না।'

'আমার আজ রাঁধতেই মন নাই। মুড়ি খাব ভেবেছিলম।'

'নুকলে অটলদা, সেদিন তোমার কাছে খেয়ে যে তৃপ্তি হয়েছে, আর সাঁচা বলছি এ ক'দিন ঠিকঠাক খাওয়াই হয় নাই—তুমি আর না করো না। অধম্ম হবে।'

অটল ভাবে, তা হবে বৈকী। ক'দিন ঠিকঠাক খাওয়া হয়নি। সে না হয় রেঁধে দেবে। তবু বলে, 'তোর জন্যে আমার সব বদনাম করছে।'

'ভালমানুষের গায়ে বদনাম লাগে না। হাঁসের পালকে যেমন জল লাগে না।' জগা বলে, 'গাঁয়ের লুক আমাকে ছি-ঘিন্নে করে, তুমিও করলে কুথা দাঁড়াই!'

'আমার কাছে দাঁড়াতে গেলে চুরি ডাকাতিতে থাকা চলবে না।'

জগা ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'ছেড়ে দুব। আবার সাইকেল রিকশ চালাব।'

অটল উৎসাহিত হয়, 'খুব ভাল হবে।'

লম্বা শ্বাস ফেলে জগা বলে, 'তুমি আমাকে খুবই বিশ্বাস কর। জান কেউ করে না।'

'করবে। কাজে দেখিয়ে দে।'

'ভাল কথা, তোমার দেনাশোধের টাকা হল?'

'হয়েছে। কাল-পরশু যাব ভাবছি আমোদপুর। ছিদেমের বৌ ত ওখানেই থাকে। দেনাশোধ করলে আমার গা থেকে জ্বর নামবে।'

'তোমার কথা বলছিলম শাঁখাকে। বলল, দেখ কত ভালমানুষ আছে এমনি। একদিন আসতে বলো আমাদের ঘরে।'

'শাঁখা কে?'

'ভরতের বোন। ওই যে রিকশা চালাত আমার সঙ্গে। অ্যাক্সিডেণ্ট হল। চাপা পড়ল লরিতে। বছর দুই ত হয়ে গেল।'

অটল বলল, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। শুনেছিলম। তা বাপ মা আছে?'

'মা আছে। ভাই ছিল একটিই, দু'বোন রইছে এখন। তবে ছোটর বিয়ে হয়েছে পাণ্ডবেশ্বরে। জামাই কোলিয়ারিতে কাজ করে।'

'হ্যাঁরে জগা, ছেলেট ত মরেছে। সংসার চলে কী করে।'

'শাঁখা পোণ্টমাণ্টারের ঘরে কাজ করে, মা-মেয়ের চলে যায়।'

'ছোটর বিয়ে হল, শাঁখা বিয়ে করল নাই কেনে।'

'না, করল না।' জগা বলল, 'করলে ত বেঁচে যাই।'

'বলিস কী। ও কী তোর দায়।'

'কে যে কার দায় অটলদা, তা কে বলতে পারে!'

খাঁড়া কলাপাতায় মুরগী কাটাকুটো করে আনে। তারপর দোকান থেকে এনে দেয় তেলমশলা। ঘরে চাল আলু আছে।

অটলকে রান্না করতে হয়। তার মধ্যেই সে জগার প্রেমকাহিনী শোনে। সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়েছে। আঁধার কালি মেখে সামনে দূরে একাকার। লম্ফের শিখা বাতাসে কেঁপে আগুনে আলো ছড়িয়ে রাখে।

শাঁখার সঙ্গে প্রেমের শুরুটা শিবপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর মেলার সময়। ভরতের বোন বলে জানা ছিল। কিন্তু মেলায় সেদিন শেষ বিকেলে ওই সম্পর্ক নয়, এক অপরূপা তরুণীকে সে দেখে। গায়ের রঙ কালো, মাঝারি দেহগঠন, ঈষৎ লম্বাটে মুখ, বড় বড় চোখ, শাড়ি ব্লাউসের মোড়কেও সুউন্নত স্তন, কোমর, কপালে রুপোলী টিপ, গলায় সোনালী পুঁতির মালা, হাতভর্তি কাচের চুড়ি, সব মিলিয়ে তার কাছে এক সৌন্দর্যশালিনী। সে তখন মুগ্ধ আলো দেখছে, আলো টানছে তাকে, যেন পতঙ্গ। বিকেলের মেলায় তেমন তো ভিড় নেই। রাতে পঞ্চরসের আসর বসবে। তখন পাঁচ-গাঁ ভেঙে আসবে। চা, তেলেভাজার দোকান, মাটিতে পাতা কাচের চুড়ি, কমদামী স্টেশনারীর সারিবন্দী দোকান, মিষ্টির দোকানের মধ্যে মাঠটায় ঘুরছে খুবই কম লোক। বেশিরভাগই ছোট ছেলেমেয়ে। বাঁশি বাজছে, বেলুন উড়ছে। শাঁখার সঙ্গে ছিল ওর বোন। তার দিকে চোখ রেখে ছুরি মারা হাসি

শাঁখা বারকতক ছুঁড়ে দেয়। এগিয়ে সেই প্রথম কথা বলে। ওর বোনকে দুটো টাকা দিয়ে 'যা মিষ্টি খেয়ে আয়' বলে কথা বলার সুযোগ করে নেয়। শাঁখা বোঝে তার খাঁচায় বন্দী হয়েছে পাখি। ঠোঁটে ঝুলন্ত হাসিটুকরো সে রাখে, যেন দানাপানি পাখি খেতে আসবে। বলে, 'হাঁ করে কী দেখছিলে আমাকে।' জগা সাহস করে সে মুহূর্তে বলতে পারেনি। সেই শুরু। তারপর ভয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, ওদের পরিবারের সঙ্গে মিশে যাওয়া, শাঁখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সে বন্ধ হয়ে যায়। শাঁখা বড় বিস্ময় তার কাছে, কতটুকুই-বা মেয়ের শরীর, চেপে ধরলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, অথচ সে ভয় পায়। টের পায় তার ভেতরটা সম্পূর্ণ দেখতে পায় মেয়ে। সাইকেল-রিক্সা চালানো বন্ধ করে চুরি-ডাকাতিতে থাকার পর শাঁখা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কেঁদেছে, পায়ে পড়েছে। সে শাঁখার জন্যে খেটেই খাব বলে ছাড়তে চেয়েছে—পারেনি। শাঁখা এখন তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না বলেও রাখে, কথা বলতে চায় না বলেও কথা বলে, ঘেন্না করেও কাছে ডাকে, টাকাপয়সা নেয় না, অথচ অভাবের কথা বলে। এ বড় কষ্টের। বিয়ে করে সংসারী হলে জগার ঝামেলা মিটত। মেয়ে যেন শরীরে বিদ্ধ হয়ে থাকা একটা তীর। উৎপাটন করে ফেলা যায় না। রক্ত ঝরায়, যন্ত্রণা দেয়। হাতে ফলকে ডেকে তাকে শুনিয়ে কথা বলে, ফাটা মাথা দেখে চোখের জল ফেলেছে, আবার ঘেন্নাও দেখিয়েছে।

অটলের শুনে মনে হয় শাঁখা বড়ই ভালবাসে, ঘেন্নায় সরে যায়নি জগার কাছ থেকে। কথা বলে না সে তো অভিমানে, ভালবাসায়। অটল অনুভব করে জগাকে ভাল করার একটা সঙ্গী সে তাহলে পাবে। তার সারা মন আচ্ছন্ন করে জগা শাঁখা প্রেমকথা। জগার বলার বাইরেও সে অনেক দৃশ্য দেখতে পায়, অনেক কথা শুনতে পায় প্রেমিকপ্রেমিকার।

রান্না হয়, খাওয়া হয়, জগা চলে যায়। তারপর বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে ডলির ঘরে যাবার কথা ছিল। এত রাতে যায় কী করে। সকালে যাবে।

সকালেও যাওয়া হয় না। ঘোষেদের হরেন ডেকে নিয়ে যায়। শিবপুরে বাসে ধরিয়ে দিতে হবে। সঙ্গের বোঝাটা নিয়ে যেতে হবে। বিশ কেজি-র মত চাল আছে। না করা যায় না। তিনটে টাকা দেবে। দুপুরে ডলির ঘরে গিয়ে দেখে তালা ঝুলছে। কে জানে কোথা গিয়েছে। গোঁসাইয়ের মেয়ে ফুলু বলল, 'ডলি-কাকীকে খুঁজছিলে!' ঠোঁটে রহস্যভরা হাসি, কেমন যেন চাউনি, কী যে বলতে চায়! ভালবাসার কি কোন গন্ধ থাকে, মুখে না বললেও সবাই টের পায়!

চকার জীবনে একদিন লেটো আলকাপ ছিল। মালতীর শ্বশুর সিধুর দল ছিল, নামও করেছিল দল, নেমন্তন্ন পেত বিভিন্ন গাঁয়ে। হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, বাঁশি, ঢোল, ড্রেসও করেছিল। দল ভেঙেছে কবেই। শুধু তো চকা নয় লেটো আলকাপই লুপ্ত। যাত্রা থিয়েটার আছে, সে তো ভদ্রলোকদের। গোপালপুরে মাঝেমধ্যে হয় বটে থিয়েটার তাতে চকার মানুষদের নিজস্বতা কোথা? কুশীলববৃন্দ বাগ্দী বাউরি নয়, তাদের ভাষার টান নেই সংলাপে, লঙ্কাকে 'সপরে', কুমড়োকে 'ডিংলে', চিংড়িমাছকে 'জালমাছ', গাঁয়ের পথকে 'কুলি', পেয়ারাকে 'আঁজির', গায়ে লাগা কি বেগোনে 'বাজ্জা', কাককে 'কেয়া' এমন কত কথাই তো বলে না, 'বটে'র ব্যবহার করে না—বড়ই ভদ্র। ফলে ইদানীং ঝাঁকসু, মুর্শিদাবাদ ডিঙিয়ে আসাতে চকার মেঠো গানে জায়গা পেয়ে যায়, ভিড় জমে আসরে, বলে ঝাঁকসু গায়েন, যা পঞ্চরস, লেটো আলকাপ ঝুমুর যাত্রার মিশ্রণে এক আধুনিক রূপ। পুরোনকে নতুন রঙে নতুন ঢঙে সাজানোগোছান। কীর্তন্ত আলকাপ শিল্পী ধনঞ্জয় সরকারের। তবে তাঁর নাম ক'জন জানে! শিবপুরে একটা দল পঞ্চরস গেয়ে গেল ক'মাস আগে। আবার আসছে পরশু। ভোলা বিষ্টুরা গরু চরাতে গিয়ে ঠিক করে সন্ধেবেলায় যাবে। অটলকেও যেতে হবে।

'তোরা ছেলে-ছোকরারা যা। আমি যাব না।'

'তুমি কী গো কাকা, দেখবে কত মজা। টিকিট আমি দুব।'

'তুই দিবি কেনে ভোলা, যাই যদি আমিই দুব।'

অটল পঞ্চরস দেখতে যায়। মিউজিক, ড্যান্স, পিয়া পিয়া মেরে পিয়া, কোমর দুলুনি হিন্দী গানের পর নক্সা, তারপরই 'ভাই-ভাইয়ের মিলন' কাহিনী। সরল সাদাসিদে বড়ভাইয়ের কৃচ্ছ্রসাধনে আত্মত্যাগে ছোটভাই শিক্ষিত হয়ে ম্যানেজার হয়। প্রেম করে বড়লোকের 'বিটি'র সঙ্গে, বিয়ে হয়, অতি আধুনিকা ছোটবৌয়ের দাদা-বৌদিকে তাচ্ছিল্য, শহরে গিয়ে বন্ধুবান্ধব, পার্টি শাড়ি গয়নায় স্বামীকে প্রচুর ঋণে ফেলা, শেষ পর্যন্ত পুলিশ হাজতে পাঠায়। বড়ভাই ছুটে আসে। বৌদি গয়না দেয়, দেনা করে ভাইকে বাঁচায়। শেষপর্বে সতীলক্ষ্মী হয় ছোটবো। দেবতা ভাসুর দেবী বড়-জার কাছে আসে, গাঁয়ে থাকবে, শ্বশুরের ভিটেতে রাঙা শাড়ি পরে প্রদীপ জ্বালাবে। দুভাইয়ের মিলন হয়, বাস্তব ভাঙা ঘটনার বিন্যাস হাসি কান্না মজা রসসিক্ততায় দর্শকরা উদ্বেল হয়, অতি উৎসাহে শিস মারে, হাততালি দেয়।

সারা রাস্তা নক্সার কৌতুক, ছোটবৌয়ের অঙ্গভঙ্গী, বিবাহপূর্ব প্রেমের দৃশ্য, গান নিয়েই আলোচনা। অটল বড়ভাইয়ের মহত্ব, বড়বৌদির মাতৃপ্রতিমতার ঘটনা তুলতে গিয়েও চাপা খায়। দুঃখ হয় অটলের। গুম হয়ে সে হাঁটে। ভাবে, আহা সব মানুষ যদি বড়ভাইয়ের মত হত।

৪

বৃষ্টি নামে। মাটি ভিজে শস্য পিপাসায় উদ্বেল হয়। গাছ, ঝোপঝাড়, লতাগুচ্ছ, ঘাসজমি পান সেরে স্নান করে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে মাটি। তবে পাথুরে মাটির ঢাল, সঞ্চয় রাখতে পারে না, 'জল দাও'য়ের প্রার্থনা নিয়ে চাষের শুরু হয়। লাঙল পড়ছে মাটিতে, গোবর সার ফেলছে গো-যান, ক্ষেতের আল বাঁধা হচ্ছে, কোন ক্ষেতের ঢিবি মেরে সমান্তরাল করা হচ্ছে।

অটল শীতল ভিজে মাটিতে সকালে হেঁটে যাচ্ছে শিবপুরের দিকে। আমোদপুর যাবে। ছিদেমের বিধবাকে টাকাটা দিয়ে আসবে। টাকা বড় নচ্ছার জিনিস, থাকলে জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা। মানুষের সম্পর্ক ওই টাকার সুতোয়, পাপপুণ্যের ঘোরাফেরা ওই সুতো ধরে, সুতো গোটানো আর ছাড়ার মধ্যেই মানুষের চরিত্র। ভাবনাটা অটলের মাথায় খেলা করে যাচ্ছে। দেনার দায় বড় দায়। টাকাটা দিয়ে আসতে পারলে যেন বেরিয়ে আসতে পারবে কাঁটাবন ছেড়ে। কাঁটাবনই তো। দেনার জ্বালা কাঁটার জ্বালার চেয়েও বেশি।

শিবপুর মোড়ে চোখে পড়ে পুব মেঘের শ্লেটরঙা শাড়িতে সাজছে। রোদ নেই। হাওয়ায় বৃষ্টি নামানোর আকুলতা। টানা বৃষ্টির দিন নেমে পড়লে চাষের অসুবিধে। এখনও তো বীজতলাই হয়নি। দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে। চালার দোকানগুলো ফাঁকা ফাঁকা। বেঞ্চি পড়ে রয়েছে। বসতে পারে সে। একটা লরি বেরিয়ে গেল, ওদিক থেকে মোটরসাইকেল আসছে। সে সিউড়ী যাবে, ওখান থেকে আমোদপুরে। চায়ের দোকানে সিঙাড়া ভাজার ঘি ময়দার গন্ধ উঠছে। বংশীর দোকানে জিজ্ঞাসা করে, 'সিউড়ি যাবার বাস এখন আসবে?'

'আটটায় আছে।'

পাশে ঠোঙা হাতে নিয়ে অটলকে দেখছিল এক মেয়ে। বলল, 'অটলদা বট?'

'হ্যাঁ।'

'আমি শাঁখা।'

তাহলে এই শাঁখা। রোগাটে মেয়ের পাতলা ঠোঁটে পরিচিতের হাসি। বেগুনি ছাপা শাড়ি, বেগুনি ব্লাউসে ঘেরা শরীর। গলায় সরু রুপোর রেখা, কানে দুল,

কপালে টিপ। ছোটখাট চেহারা বটে, কিন্তু বড় আঁখিতে টলমলে মায়া, সুন্দরী বলবে না. তবে এক ঢাল কালো চুলে, প্রতিমার মত চিবুকে, কপালে, নাকের গড়ন আর ঝকঝকে দাঁতে মেয়ের কী যেন আছে—বড় ভাল লেগে যায়।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ভেবেছিলম চকাতে যাব দেখা করতে!'

'কী কথা।'

'এদিকে সরে এস।' শাঁখা হাঁটে। দোকান ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। থমকে বলে, 'তোমার কথা কত শুনেছি। ডাকাতট তোমাকে আমার কথা বলেছে ত?'

'তা বলেছে।'

'তুমি বাঁচাও।' মেয়ের গলা ভেঙে যায়, 'উকে ভাল করে দাও।'

মেয়ের ঢলঢলে মুখে কষ্টের কালিমা, বুক ভাঙছে, চোখ ছলছল। অটল তো নেহাতই গরুবাগাল, তবু বলতে ইচ্ছে করে, ভাল করে দেব মেয়ে।

শাঁখা বলে, 'জান সাঁতে বাউরির দলে যেছে রিক্সা ছেড়ে যখনই শুনলাম, তখন থেকে পিছা লেগেছি। বুঝালাম, রাগ দেখালাম, কিন্তু পারছি না। বুড়োবাবার জল পোড়া আনালাম, কবচ নিয়েছি, কত মানত করেছি, কিন্তু কিছুই না। এই তো মরতে মরতে বাঁচল। শুনলম্ তোমাকে মান্যি করে খুব, তোমার কাছে যায়, তুমি উকে ভাল করে দাও। আমি পারছি না, ঠিক বুঝুলে উ ভাল হয়ে যাবে।'

জগাকে ভাল করার জন্যে মেয়ের আন্তরিকতা, আগ্রহ, ভাল হবে বিশ্বাস অটলকে ভরিয়ে দেয়। তার মত গরুবাগালের কাছে কেউ প্রার্থনায় আসে না, মেয়ের কথায় শক্তি উৎপন্ন হয়, বিশালতা আসে তার মধ্যে।

'ভাল করতে পারবে?'

'তা পারতে হবে বৈকী!' অটলের বিশালতায় গম্ভীর ধ্বনি বাজে, 'তোমার পারা বোনের লেগে ভাল না করে উপায় কী বল!'

'তাহালে দাদা হলে!'

'জগার দাদা তুমার দাদা হবে নাই? বোন পেলম সকালবেলাতে। সুখ লাগছে।'

অটল মুখ দেখে শাঁখার। দেনা শোধ করতে যাবার পথেই সে একজনকে পেয়ে গেল। কে বলে অটলের কেউ নেই পৃথিবীতে। কে বলে? আসলে ঠিকঠিকানা তাদের জানা নেই। আছে, অটলের জন্যে মানুষ আছে। এত কাছেই তো জানা ছিল না। বুক ভরপুর হয় তার।

শাঁখা ঘরে একদিন আসতে বলে চলে যায়। বাস আসে। উঠে পড়ে অটল।

আমোদপুরে ছিদামের শ্বশুরঘর খুঁজেপেতে কষ্ট হল না অটলের। চেনা জায়গা। চিনির মামার ঘর। খুড়তুতো ভাই লখারও শ্বশুরঘর। আগে আসাযাওয়া ছিল। গাঁ ঢুকতেই তিনটে ঘেঁষাঘেঁষি পুরোন অশ্বত্থ ডালপালায় মস্ত ছাউনি ফেলেছে। পাশেই কামারশাল। বাস থেকে নেমে বাঁদিকে হাঁটলে পুকুরপাড় বাগদীপাড়া।

পুবের মেঘে বাসের মধ্যেই কোড়ো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পেয়েছিল অটল। এখন তকতকে আকাশ। গা-ভেজা মাটি, পথ, খড়ো চাল, জায়গায় জায়গায় সামান্য করে জল দাঁড়িয়ে থাকা বর্ষণ চিহ্নে রোদের ছ'টা মারা, তাপ বেশই আছে।

ছিদামের বৌ আশা অবাক তাকে দেখে। চট পেতে দিল দাওয়ায়। খড়ো চাল, খুপসি ঘর, সামনে উঠোন, মুখোমুখি ভাই বাসুদেবের ঘর, দরজায় তালা ঝুলছে, উঠোনে মুরগী চরছে, একটা খয়েরী ছাগল শুঁকে বেড়াচ্ছে এধার-ওধার। অটল দেখে অবাক হয়, ছিদামের বৌয়ের এ কী দশা! বৈধব্য শূন্যতা শুধু নয়, মেয়েমানুষের সবই যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। মাথায় রুখুশুখু চুল, বসা গাল, শিরা ওঠা হাতে অযত্নহীনতার আঁচড়, ছেঁড়া শাড়ি। ভাবা যায় সেই বৌটিকে। রঙীন শাড়ি, কালো চুলের মাথা, পানরাঙা ঠোঁট, বয়সকে তুড়ি মেরে যেন সর্বদাই নবযুবতী, অহঙ্কারের ডগমগানি, স্বচ্ছলতার ভুরভুরানি কথায় ভঙ্গীতে ছড়াত! তার এ কী দশা!

'কোথা এসেছিলে?'

'তোমারই কাছে।

আশার ভ্রূতে বিস্ময় জাগে, 'আমার কাছে।'

'হাঁ, তা তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছি না। এটা ত ভাইয়ের ঘর! নাই?'

'ছেলেটা কয়লা দোকানে লেগেছে। মেয়ে বামুন ঘরে কাজ করে। ভাই শ্বশুর-ঘরে গিয়েছে কালই, বৌ নিয়ে।

'ভাই তোমাকে দেখে ত!'

আশার শুকনো ঠোঁটে বেদনার স্বর বের হয়, 'যা দিনকাল! মানুষ নিজেকে দেখতেই হিমসিম। একসঙ্গেই ছিলম পেথমে, এখন ভিন্ন থাকি। তবে বিপদে-আপদে দেখে, ঝগড়াঝাঁটি নাই। তা তুমি কেনে এলে বুঝতে পারছি না। চেনা গোপালপুরের কেউ কোন খবর রাখে না—আমিও রাখি না।'

'ছিদেমের কাছে ধার ছিল। তারই শোধ দিতে আসা। ঢের আগে দিয়া উচিত ছিল, পারি নাই। কিছু মনে করো না।'

'বাঁচালে। ধার ছিল শুনে ভাবলাম তুমি এতদিন বাদে আদায়ে এসেছ।'

'ছিদেমের লুকের কাছে ধার ছিল?'

'তা ছিল বৈকি। তা না হলে আমার ভিখিরির দশা হয়। পেতও নন্দের কাছে। কিন্তু দিলে ত—কেউ দিলেক না। আমি ত জানতমই নাই।'

'আমি গড়া থেকেই ভেবেছি দিয়ে দেব। জোগাড় করতে পারি নাই।'

'তোমার কথা ভেন্ন।'

'সুদ লেবে না বলেছিল।' পকেট থেকে টাকা বের করে অটল, 'সাড়ে তিনশ। আমার হিসেবের এপাশ-ওপাশ নাই। ঠিক দিছি।'

টাকাটা নিয়ে আশা বলে, 'হিসেব কখনও ঠিক থাকে?'

'কেনে থাকবে না।'

'এই তো আমাকে দেখ, হিসেব ঠিক থাকলে এই দশা হয়? জেবনের হিসেব সব সময়ই গণ্ডগোলে। ভাল হল টাকাটা পেয়ে। শাড়ি নাই, দেনাও হয়েছে একশ টাকা ভাইয়ের কাছে। শোধ করতে পারব। কিন্তু তোমার কাছে পাওনা থাকতে পারে ভাবিই নাই।'

অটল বলল, 'ছিদেম আমার খুব উপকার করেছে।'

'নিজেরও স্বার্থ ছিল।'

'স্বার্থ ছিল? কী?'

ওদিক থেকে একটা কুঁজো বুড়ী এসে দাঁড়াল। আশার কাছে পরিচয় নিল। তারপর চলে গেল। অটল বলল, 'তোমার কথার রহস্য বুঝছি না।'

'তুমি ভাল মানুষ বট, তাই সন্দ করনি বৌকে।' আশা যেন ঝেড়ে ফেলতে চায়। বলে, 'বাদ দাও উসব কথা। চকা গোপালপুরের খবর বল।'

'উঁহু। তুমি যেন কী ভাঙছ না?'

আশা বলে, 'আমার সোয়ামীর তোমার বৌয়ের গোপন পিরিত ছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মরা মানুষের চরিত্তিরের কুব্যাখান করতে নাই। তুমি এলে, টাকা দিছ হুহু করে উসব উঠে আসছে বুকের ভিতরি থেকে। তুমি ত জান না এ নিয়ে কত ঝগড়া করেছি। টাকা ছাড়াও গোপনে আরও কত দিয়েছে তোমার বৌকে। একতুং মিথ্যে বলছি না। একদিন দুজনাকে ধরে ফেলেছিলম।'

'চিনি। আমার বৌ চিনির কথা বলছ! ভুল করছ নাই?'

'ওমা ভুল করব কিসের লেগে!'

অটলের যেন সুউচ্চ মনোরম বর্ণময় চমৎকার অলঙ্কৃত প্রাসাদের মত বিশাল দাম্পত্য জীবনের অস্তিত্ব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ধূলিঝড়, শব্দের বিশাল আর্তি ভরিয়ে দেয় বাতাস। তারপর অপার শব্দহীনতা—যেন পৃথিবী মরে গিয়েছে, সাড়

নেই। অন্ধকারের পর ঝাপসা তারপর ধীরে ধীরে যেন প্রকাশিত হয় সামনের দৃশ্য।

আশা বলল, 'কী হল তোমার?'

'বিশ্বেস হছে নাই।'

'বিশ্বেস করেই-বা লাভ কী। দু'জনার কেউ নাই আজ।' আশা এখন অটলের মুখ দেখে টের পায় অনুচিত কাণ্ড সে ঘটিয়ে বসেছে আবেগের বশে। বলে, 'উ নিয়ে ভেবো না, বৌ তুমাকে ভালবাসত খুবই। তবে পেটে ছেলে ধরার লেগে খেপে গেইছিল। আমার সোয়ামীর সঙ্গ তারই লেগে। তা হল ফল: কপালে না থাকলে, মা ষষ্ঠীর কিপা না হলে বাঁজাই থাকতে হয়।'

ধন্ধে অটল করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে।

আশা বলল, 'কী করব, চামড়ার মুখ বেরিয়ে গেল। তোমাকে কষ্ট দিলম। দু'বেলা ভাত জুটছে না, মানুষটা খরচা করে আমার লেগে কিছু রাখে নাই।'

'আমি তাহালে চলি।'

'ওমা, যাবে কী! দুপুরে এলে, খেয়েদেয়ে যাবে!'

'না। ঢের কাজ পড়ে।' অটল মুখে বললেও নিঃস্ব মানুষের মত হাসে, উঠে পড়ে, হাঁটা দেয়। আশা খানিকটা সঙ্গে আসে।

'আবার এসো। আর শুন ভুলে যেও। কী বলতে কী বললম।'

বাসের জন্যে অশ্বত্থের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে অটল। চনমনে রোদ উঠেছে। বাতাস নেই। মনে হয়, জীবনের কোন মূল্যবান সামগ্রী যেন অপহৃত হয়ে গেল। টাকাটা শোধ করার আনন্দ মোটেই দাঁড়াতে পারছে না। গা ঘামছে। মনে হচ্ছে সব মিথ্যে।

বাস আসতে সে ওঠে।

শিবপুর মোড়ে নেমে রোদের মধ্যে হাঁটা। এক মানুষ গিয়েছিল ফিরে এল যেন অন্য মানুষ। ছিদামের বৌ ভুলে যেতে বলেছে, কিন্তু ভুলবে কী, ধারালো করাতের মত শব্দগুলো সূচমুখ তীক্ষ্ণতা নিয়ে কাটছে। চকার দৃশ্য, পরিচিত জন, জীবনের ধারাবাহিকতা যেন একটা বাঁকের মুখে কঠিন পাথরে আটকে গিয়েছে। তার এগিয়ে যাওয়ার পথ নেই, পিছিয়ে আসার পথ নেই।

নিঝুম হয়ে সে দাওয়ায় বসে থাকে। মধ্যাহ্ন পার হয়ে রক্তিমতার বিকেল। তার ক্ষুধা নেই। খাওয়ার জায়গা ঢের ছিল, বকনাটাকে আনতে হত—থাক। একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে যায় সে। ছিদামের বৌ মিথ্যে বলেনি। কিন্তু চিনিকে চেনার কী ভুল ছিল? না ভুল কেন হবে? চিনি যা করেছে, সন্তানের জন্যে! করতেই

পারে। যা পাগল হয়ে উঠেছিল। তা বলে নিজেকে ওভাবে অন্য পুরুষে সমর্পণ করা। কিছুতেই যে তার মন মেনে নিতে পারছে না। অবিশ্বাসিনীর জন্য ক্রোধ জাগছে না, শুধু নিজেকে বারবার আঘাত দিতে ইচ্ছে করছে।

ভোলা এসে স্বাভাবিক করে অটলকে। বকনাটাকে উঠোন বরাবর করে দিয়ে দেখে। বলে, 'তাহালে এ যাত্রা বেঁচে গেল বকনট। তেজও বেড়েছে। গাই হলে ভাল হবে অটলদা। গড়ন-পিটন ভালই বটে। জানো, ওই পালদের অশ্বিকের গাইট লিও না। আজ খুঁয়াড়ে যেত। মোড়লদের ফসলে লেগেছিল। ডাকিন্ আনলম।' সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তান্বিত মুখ কালো করা মানুষটাকে দেখে বলে, 'হল কী তোমার? আমুদপুর থেকে কখন এলে? দিখা হল না ছিদামকাকার বৌয়ের সঙ্গে?'

অটল সাড়া দেয় না।

ভোলা এবার কাছে এসে তীক্ষ্ন নজরে মানুষটাকে দেখে। ভ্রু-কোঁচকায়। হল কী লোকটার। বলে, 'কী হল, রা নাই!'

'বলার কী আছে?'

'তাহলে রা সরল। টাকা নিয়েছে? সুদ চাইছিল?'

'না। সুদ চাইবে কেনে! উ ত জানতই না। পেয়ে বর্তে গেল।'

ভোলা বলে, 'জগা আবার ঝঞ্ঝট পাকিয়েছ। পুলিশ এসেছিল। দলের সব ফেরার। শুন, আমরা বাজি তুলে লিছি। জগাকে ভাল করতে মিশতে যেও না।'

'বাজির কথা লয়। উ তুলা পাড়াতে কী যেছে আসছে। জগাকে ভাল করতেই হবে।'

'তোমার কী দায় পড়েছে বলে দেখি। কত চোর-ডাকাত রইছে। সবাইকে ভাল করতে পারবে? জগাকে ভাল করে লাভ কী?'

'লাভ-লোকসানের হিসেব কে করেছে ভোলা! তবে হ্যাঁ, যদি সবাই ভাল হত, দিব্যি হত। তেমন মুরোদ আমার থাকলে বত্তে যেতম। ঢের ধম্ম হত আমার।'

'রাখ তোমার ধম্ম। নিজে যে মরবে।'

'ধম্ম করলে কেউ মরে না। লোকের ভাল কাজ করলে সুখ হয়। মনে হয়, মানুষ জনম সাথক হল।'

'আজ গোপাল আমি বিস্তে সব তাই বলছিলম, বাজি রেখে ডাকাতের হাতে তুমাকে খানখা ঠেলে দিলম।'

'ঠেলবি কেনে, আমি হুড়হুড়িয়ে নেমেছি। জগাকে টেনে তুলব।'

'নিজেই উঠতে পারবে না। তাল বলছি কাছে থেকো না। ঘরে এসে বলে দেবে যেন, না আসে।' ভোলা অনুনয় করে। তারপর নিজের মনেই বলে, 'পুলিশ ঘুরঘুর করছে, জগার দলটকেই জেহেলে ভরবে!'

অল্প পরে বলে, 'রাঁধবে না?'

'না।'

'খেতে দিয়েছিল উরা?'

'না।'

'তাহলে উপোস!'

'আমি কিছু খাব না।'

'না খেয়ে মুখ শুকনো, আবার বলে খাব না। আমি মোটা মোটা চ্যাংমাছ ধরেছি। মাকে সরষে ঝাল করতে বলেছি। তুমি আমাদের ওখানে খাবে। নেমন্তন্ন নয়। চাল দাও, মাকে বলে ভাত ফুটিয়ে দেব। ভোলা ঘরে ঢোকে। হাঁড়ি থেকে চাল বের করে। গামছার খুঁটে বেঁধে নেয়। এটা মাঝেমধ্যে তাকে করতে হয়। চাল দিয়ে অটল ওদের ঘরে থায়।

'ঘরেই তাহালে বসে থাকবে। বকনটকে বাঁধ।'

'বাঁধছি।'

'তুমি গুম্পন করে গেলে। নিশ্চয় কুনু কাণ্ড হয়েছে। পেট কেটে ত কথা বার করতে পারি না।'

ভোলা ভালবাসে তাকে। কিন্তু ওকে কী করে সে চিনির কথা বলে!

ভোলা চলে যাবার পরই মালতী এসে দাঁড়ায় উঠোনে। সন্তর্পণে আশপাশ দেখে নেয়। রোদের বর্ণে এখন শেষ বিকেলের লালিমা মিশে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে।

'ঘরেই রইছ। দুফরে একবার এসেছিলম, ছিলে না।' মালতী বসে না। দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আবার একবার পিছনটা দেখে নেয়। বলে, 'জগা এসেছিল? দেখা নাই। কাউকে দিয়ে খপরও দেয় নাই! ফনে ধীরেদেরও দেখছি নাই।'

'আমি ত কিছু জানি না।'

'ভাবলম্ তোমার সঙ্গে খুব ভাবসাব। জানতে ত পার।'

'না জানি না।'

স্বর নিচু করে মালতী জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কাছে কিছু রেখেছে নাকি?'

'কী রাখবে?'

'কুনু জিনিস কিংবা টাকা। দিদিকে ত বিশ্বেস নাই এখন।'

'রাখে নাই।' অটল বলে, 'রাখতে চাইলেই বা রাখব কেনে?'

'টাকা দিছ না ত।' বাঁকা চোখে তাকায় মালতী, 'সবাই বলছে, দেখছিও আমার চেয়ে তুমি আপনার হয়েছ।'

'তাই হয়। তুমি উর দিদি বট। আমি জগাকে বলি, ডাকাতি ছাড়তে, ভাল মানুষ হতে, খেটে খেতে— ।'

মালতী হাউমাউ করে, 'আমি কী কম বলি—শুনলে ত। একটি ভাই বটে, কুথা বেঘোরে মরবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই—কথা যদি শোনে।'

'শুনবে। ঠিক শুনবে।'

মালতী বলে, 'ঘরে কুছু নাই। ভাবলম্ যদি কিছু রেখে থাকে। তা মিছে কথা তুমি বল না। চলি দেখি, যদি কুথাম্ জুগাড় হয়।'

মালতী চলে যেতে অটল ভাবে, কিছু দিলে হত। কিন্তু তার অবস্থাও তো ঢু ঢু।

ভোলাদের ঘরে খেয়ে এসে অটল অবসন্ন বোধ করতে থাকে। ভোলা আবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানতে চেয়েছে, সে তেমন সাড়া দেয়নি। বাতাস দিচ্ছে। জ্যোৎস্না ধারায় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। দাওয়ায় ঝিম হয়ে বসে থাকার পর ঘরে ঢোকে। ভোলার মায়ের রান্নার হাতটি চমৎকার। মাছের ঝাল ডিংলের তরকারি, কলাইয়ের ডাল, তেমন তেলমশলা নেই, কিন্তু কী সুস্বাদুই না লাগে। খেতে খেতে সে কত প্রশংসা করে। আজ একটাও কথা বলেনি। বৌদি কী ভাবল কে জানে। আসলে কপালের শিরা দাপাচ্ছে। চিনুর অবিশ্বাসী মুখটা চোখের সামনে থেকে সরছে না। এলোপাতাড়ি ভাবনায় সে যেন স্রোতের মুখে কুটোটির মত আছাড়ি পাছাড়ি খাচ্ছে। ঘুমও আসতে চাইছে না। তবে অটল টের পায় না, কখন ঘুম নেমে যায়।

বর্ষা শরীরের নিবিড় ছায়াছন্নতা পড়েছে সবকিছুতে। বর্ষাগন্ধের ভুর-ভুরানিতে প্রাণীকুল, উদ্ভিদ ঘর-দুয়ার, কাঠ-খড়, মাঠ-ঘাট পুকুর-ডোবা পর্যন্ত টের পেয়ে গিয়েছে আবং মণ্ডলের ক্রিয়ার রসসিক্ততা ক্রম প্রাবল্য এনে দেবে। এই মুখীনতার ছোপ আঁকা হয়েছে শুকো ঘাসের চাবড়ায়, গাছগাছালির তৃষাতুর ডাল-পালায়, ঝোপে-ঝাড়ে। কাল সন্ধের পর বৃষ্টি নেমেছিল। রাতে বৃষ্টির বেগ কমতে অটল শুনতে পাচ্ছিল চারিদিকে বিপুল মিশ্রধ্বনির এক উৎসব। ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে বর্ষার বিচিত্র পোকাদের যেন সঙ্গীত নির্ঝরিণী। অন্ধকারে সবাই জেগে। শব্দ দিয়ে জানাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব। কোথায় থাকে বর্ষার এত পোকামাকড়! ঘাসে ঝোপে-ঝাড়ে? অটল তাদের সবার নাম জানে না। রঙ-বেরঙের নানা

আকৃতির পোকা—চমৎকার রূপময় আবার দু-একটি। হাতের পাতায় রাখতে ইচ্ছে করে। ফুলের মত ছড়িয়ে থাকে সব ঘাসের বুকে। অন্য সময় এরা কোথায় যায়! মরে যায়, তারপর আবার বেঁচে ওঠে!

অটল ভাবে, প্রকৃতির এই নিয়ম। জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তন। চিনি কী কোথাও জন্ম নিয়েছে? চিনির উপর ক্রোধ তার ফিকে হয়ে গিয়েছে। যে শোক নিজের জনকত্ব হীনতায়, যে গ্লানি তার দাম্পত্যজীবনকে মনে করিয়ে দিয়েছিল বালির ঘর নদীতীরে, তা মনে হয় সব নয়. তার মধ্যে প্রাণ ছিল, তাপ ছিল, আনন্দ ছিল। সে অনায়াসে ক্ষমা করে দেয় চিনিকে। যা পেয়েছে তাকেই ছাতার মত মাথায় নিয়ে অমন অগ্নিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। যুক্তিও গড়ে নেয়। মেয়েমানুষ সন্তান চাইতেই পারে, এ তার ধর্ম। সে দিতে পারেনি বলে অন্য পুরুষের কাছে গিয়েছে। ডলির প্রতি তার যে আকর্ষণ তাও এক ধর্ম। এতে চিনির উপর বিশ্বাসঘাতকতা হয় না, এতে সেই প্রেম সেই সুখ মিথ্যে হয়ে যায় না।

কিন্তু ডলি। দেখা করেনি বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাকে দেখে অন্যদিকে হাঁটে। কষ্ট হয় অটলের। সাহস করে ওর কাছে যেতে পারে না। অথচ রাতের বিছানায় কিংবা অন্য অবসরে, কাজের ফাঁকে অদৃশ্য ডলির বারবার উপস্থিতি। বিছানায় শুয়ে শিরশির করে শরীর। স্পর্শসুখের আস্বাদন চায়। কামনার বেগ রক্তধারায় অস্থির অশ্বগতিতে ছুটে যায়। ক্ষুরধ্বনি শরীরজমিন কাঁপায়। রক্ত কামসমুদ্রে আথালিপাথালি ঢেউ দেয়।

এমনই এক অবস্থায় সে যখন রাতের বিছানায় জাগর, তখনই কপাটের শিকলি নড়ে। দরজা খুলতে ডলি। ভেতরে ঢুকে বলে. 'বন্ধ করে দাও।' কোলের ছেলেকে অন্ধকারে ঠাওর করে অটলের তালাইয়ের উপর শুইয়ে দেয়, বিমূঢ় অটলকে সরিয়ে দরজা বন্ধ করে, 'আলো জ্বালাও। দেখতে পেছি না।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি। শুধোনর কী আছে। দেখতে ত পেছ! দেয়শালাই আছে ত!'

'হ্যাঁ।'

'তাহালে লম্ফ ধরাও।'

অটল লম্ফ জ্বালে। জ্বলন্ত শিখাটির মত সেও দোলা খায় ডলির ওপর চোখ রেখে। ডলির কপালে গোল টিপ, চিক্কণ মুখ, দু'চোখ ভরা দীপ্তি, গায়ে ছাপা শাড়ি, মাথার ভাঙা খোঁপা কাঁধের দিকে ঢলে, ব্লাউসের ফাঁকে উদ্যত স্তনের আভাসিত

ঔজ্জ্বল্য, রুপোর সরু হার তার উপর ঐশ্বর্য রেখা হয়ে আছে। বিছানায় বসেছে। ঠোঁটে হাসি। লম্ফের রক্তিম শিখাটির মত অটলও স্থির হতে পারে না। পুরুষ রক্তের ধর্মে তার শিরা-উপশিরা ক্রমশঃ অগ্নিময় হয়ে উঠতে থাকে।

ডলি যেন মন বোঝার যাদু জানে। কিংবা এও বিধাতার কারসাজি। নীরবতাও কথা বলে, ডলি অনায়াসে যা পড়ে নেয়। এবং দ্রুত ছেলেটার অস্তিত্ব বাধা হতে পারে এমন বোধে বলে ওঠে, 'কী করব! ছেলেটাকে কুথা ফেলে আসব বল। তবে ঘুমিয়ে কাদা উ থাকাতে অসুবিধে নাই।'

অটলের পলকহীন চাউনি, রক্তে আগ্নেয় আলোড়ন। তাতে ইন্ধন জোগায় মেয়েমানুষের অদ্ভুত গন্ধে ভরা এই ঘর। নেশাচ্ছন্ন অটল অনুভব করে ঘরের পরিপূর্ণতা। রাতে তার ঘরে কেউ মেয়েমানুষকে দেখে ফেলতে পারে এমন শঙ্কা মনে ঠাঁই পায় না, ডলি হঠাৎ কেন ভাবনাও আক্রমণ করে না—দু'চোখ ভরে সে দেখে।

'দেখা হয়েছে আমাকে!' ঠোঁটে হাসি যেন কামরাঙা ফুল ঝরায় টুপটাপ।

ফুঁ দিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিয়ে বলে, 'কী গো, কথা বলবে না। চলে যাব।' ডলি উঠে দাঁড়ায়, হাত ধরে অটলের বলে, 'ধরে বসাতে হবে নাকি।'

অটল বসে। হাত ধরার স্পর্শ ঘনিষ্ঠতায় অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ভেতরে জোরালো আঘাত হানে। সর্বাঙ্গ উন্মুখ হয়।

'ডরে মরে গেলে। কেউ যদি আসে, তার লেগে। কী গো কথা বলবে নাই?'

'কী বলব।' অটলের কাঁপা গলায় শব্দগুঁড়ো বুঝি ঝরে।

'যাক্ তাহলে কথা ফুটল।' ডলি সরে আসে, চাপা উষ্ণশ্বসে, ঘনিষ্ঠ গলায় বলে, 'মেয়েমানুষ রাতে ঘর ছেড়ে পুরুষের ঘরে ঢুকে আশ্রয়ের লেগে, বাঁচার লেগে।'

'কী হয়েছে? ঘর থেকে চলে আসতে হল কেনে?'

'ফনের লেগে।'

'ফনে কী করেছে?' কামবৃত্ত থেকে নারীর অসহায়ত্বের ঘটনা অটলকে বের করে।

'ফনে আজ জিদ ধরেছিল। সন্ধের মুখে ঘরে ঢুকে বলল,' থাকবে রাতে। উর সঙ্গে শুতে হবে। না করব কী। শুনবে না। বলে, লাও একটুং সাজগুজ কর। সাজতে হল। দেখছ ত বাহার। তখনই মাথাতে বুদ্ধি এল। বললমু গলাতে কিছু না ঢেলেই। আমি একটুং মদ খাব। ওমনি ছুটল আনতে। সেই ফাঁকে ঘরে কুলুপ এঁটে চলে এলাম।'

এমন নিশ্চিন্তে মেয়েমানুষ বলে কেন গল্পকথা শোনাচ্ছে, তার নয় অন্যের।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ঝাপট চিহ্ন নেই। শোনামাত্র ঝাঁকুনি খেয়ে অটল পূর্ণ সচেতন, ধর্মাধর্ম বোধে আশ্রিতার প্রতি কামপ্রবৃত্তির দাসত্বে সেও যেন লজ্জায় কিংবা সংস্রব চক্ষুর ধমকানিতে কুঁকড়ে চায়।

'কী থাকতে দিবে ত।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তুক ফনেকে এত সাহস ত তুমিই দিয়েছ!'

'দিতে হয়। নইলে বাঁচা যায় না। তুমি ত দেখেও দেখ না, খোঁজ লাও না।' কাচের চুড়িপরা নরম হাতের চাপ দেয় ডলি অটলের কাঁধে। উষ্ণ শ্বাস ফেলে।

রমণীর শ্বাস গন্ধ স্পর্শচাপ অটলের পেশীকে আবার জাগিয়ে দেয়। হিম-বাতাসের যে ঝাপট তার প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে দিচ্ছিল তা আবার তাপ পায়, কোঁকড়ান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত হয়।

'বেশি খোঁজ নিলে রাগ হত তোমার।'

'হায় কপাল এই তুমি আমাকে বুঝলে!' শব্দ করে কপাল চাপড়ায় ডলি।

অটল টের পায় না কখন তার হাত বেষ্টন করে যুবতীর শরীর। অন্ধকারে যেন ফুলের স্তূপ, নরম তাঁর গন্ধময়, স্নায়ু অবশকারী—আকণ্ঠ কামআতুর পুরুষ করে দেয় তাকে। সে ডলিকে আকর্ষণ করে, পেষণে নিজের সঙ্গে মেশাতে চায়। অস্ফুট শব্দ করে যুবতী। তারপর পেলব লতায় মত জড়িয়ে যেতে থাকে। অটলের মুখ নেমে আসে কাঁধে, গলায়, হাতড়ায় ঠোঁট, ব্যগ্র হাত ছোটে বুকের দিকে। ভয়ঙ্কর ব্যস্ততায় চেতনায় শুধু সুখের দিকে ধাবিত হওয়ার অদম্য স্পৃহা। কামগ্রাসী ধ্বনিতে উষ্ণ শ্বাসপাতের মধ্যে ডলিকে সে দু'হাতের ধারালো বন্ধনে টুকরো করে দিতে চায়।

ডানা ছড়িয়ে পাখির ওড়ার মত ডলি ছটফট করে, 'শুন—শুন—আহা ছাড়, ছাড়।' তারপর অমান্য পুরুষকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ফেলে দেয়, 'তুমিও একট ফনে। আমি চিঁচাব।

আলগা হয়ে যায় অটলের হাত। কামবন্যার প্রবল বেগ যেন পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খায়। ভাঙার আস্ফালন শক্ত দেওয়াল মুহূর্তে মুছে দেয়। অদ্ভুত স্থিরতায় বড় অসহায় বোধ করে সে। যেন বোঁটা আলগা পাতা, যুবতীদেহ নয় তার পাশে অন্ধকারে পড়ে আছে কাঠ, খড় কিংবা মৃত্তিকা খণ্ড।

ডলি টের পেয়ে যায়, 'ভয় লেগে গেল ত। তবে পাবে আমাকে। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে।'

কী কথা জানার কৌতূহলও জাগে না। এ কী করছিল সে। অনুশোচনায়

বেদনা গাঢ়ত্বে সে আবৃত হয়।

'জগাকে মদের সঙ্গে বিষ দিতে হবে। যেমন আমার সোয়ামীকে দিয়েছিল আর কী। তা বাদে আমাকে নাও। কথা দিলেই আমি টুঁ শব্দ করব না।' ডলি স্তনচাপ দেয় পিঠের দিকে। গলায় কাঁধে উষ্ণ শ্বাস ফেলার সঙ্গে চিবুক বসিয়ে রাখে।

কিন্তু এখন অটলের দেহমন ঘূর্ণিঝটিকা বিধ্বস্ত। যেন তাকে উপর-নিচ নাগরদোলায় চরকির বনবনানিতে আবর্তিত করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মস্তিষ্কে অব্যয় অক্ষয় ধর্ম। বলে, 'আমাকে অধর্মে ফেলো না গো।'

'অধর্ম কিসের। পাপী শাস্তি পাবে।'

'তুমি ঘর যাও।'

'আমাকে চাও না তুমি।'

'ধর্ম আছে জগার বিচের সে করবে। তুমি আমি কী!'

'ধর্ম মানুষের হাত দিয়ে করায়। তুমি ধর্ম মান। তুমিই শাস্তি দাও। ফনে বলেছিল শাস্তি দেব। কিন্তু না উ লয়, তুমি—তুমিই পারবে।'

'আমি পারব না। তুমি ঘর যাও।'

'যাবার লেগে আসি নাই।' ডলি এবার দু'হাতে জড়ায় পুরুষকে।

গ্রহণের কোন উদ্যম নেই পুরুষের। রক্ত ভয়ে শীতল। বোধে নারীশরীরের নরম উষ্ণ স্তনের চাপ, বাহুলতার রোমাঞ্চ, কামনাসিক্ত ওষ্ঠের লালা, ঘনশ্বাসের কাম-তরঙ্গ যেন ব্যর্থতার পাথরে প্রতিহত হয়।

'কী হল। ঠাণ্ডা মেরে গেলে। লাও—আমাকে লাও।'

অটল শুধু শৈত্য থেকে গভীরতর শৈত্যে ডুবে যেতে থাকে।

'তুমি আমাকে চাও না?'

'চাই। কিন্তু এমন করে লয়। তুমি শান্ত হও।'

'হই কী করে গো। ভেতরে যে ঢেক জ্বালা।'

'তুমি চুপটি করে ঘুমোও। এখুন রাত; সকাল হোক সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, যাবে না?'

'হারাকে তুমি খুব ভালবাসতে?'

'জানি না। তবে তোমাকে ভালবাসি।'

'আমার কথা এখন রাখ।'

'রাখলে চলবে কেনে। রেতে যখন এসেছি—। তুমি আমার জ্বালা মেটাও।'

'বলছি তুমি ঘুমোও।'

'তুমি পুরুষ লও। না, তুমি পুরুষ লও।'

বাইরে অন্ধকারে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর, বর্ষার পোকাদের বিচিত্র নানান ধ্বনি বয়ে যাচ্ছে। অটলের কানে তার সঙ্গে বাজে ঘরের মধ্যে মেয়েমানুষের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বাইরের শব্দ বাইরে থাকে, কিন্তু কান্না তার শরীরের মধ্যে সমস্ত শিরা-উপশিরাময় বয়ে যায়। শব্দহীন তার নিজস্ব কান্না ডলিকে বলতে দেয় না তুমি কেঁদ না। কেঁদ না। অমানিশার অনন্ততা নিয়ে ভাঙাচোরা অটল বসে থাকে, সঙ্গে থাকে নিদ্রাহীন সহস্র চক্ষু।

অটল বকনাটার লোমে হাত বুলোয়. ভাবে, না বেটি এ যাত্রা বেঁচে গেল। কেমন চেকনাই হয়েছে। নতুন ঘাস, বৃষ্টি চতুর্দিকে তরতাজা ভাবে এনেছে শুখো এলাকায়, মানুষ অন্য প্রাণীরও সেই ভাবের ছায়াঘনতা। ভাবে, বকনাটা গাই হলে দাম দেব। দুধ বাছুর। কিন্তু তার জন্যে ঝঞ্চট কম নয়। অত লাভে তার কী দরকার। একা মানুষ।

একা মনে হলেই স্মৃতির দাপট। চিনির রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর চাবুক শাসানি মনে। ডলি ছায়াছন্ন সবুজ বৃক্ষ হয়ে মাথায় থাকে, রোদ আড়াল করে, পাতার নরম স্পর্শে আবার গড়ার জন্যে আকুলিত করে মন। কিন্তু ডলির অমন নরম চোখের চাউনি, চোখেমুখে লাবণ্যের সরলতা, তার মধ্যেই যে নাগিনী লুকিয়ে রয়েছে। ছোবল দিতে চায়। বিষথলি টলমল করছে। অটল যে কী করে।

রাতে তার ঘরে আসার পর ভোর ভোর বেরিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন দেখা নেই। সেও যেতে পারেনি। ভাবে, ধর্ম তাকে রক্ষা করেছে। সে রাতের ঘটনা কেউ না জানালেও আকাশের হাজারো দেবতার চোখ এড়ানর জো তো নেই, তারা দেখেছেন। ডলিকে সে ভালবাসে। সাঙা করার পর মেয়েমানুষ তার হবে। তখন দেহ পেতে পারে, জীবধর্ম পালন করতে পারে। তার আগের সম্পর্ক ধর্মের চোখে পাপ। তবু ডলির তাকে কামনার মধ্যে সন্দেহের একটা বীজ থেকেই যাচ্ছে। সে তো চিনিকে ভুলেছে। সব শোনার পরও ক্ষমা করে দিতে পেরেছে। ডলি তো তার স্বামীকে ভুলতে পারেনি। এখনও প্রতিশোধস্পৃহার শিখাটি জ্বলছে। ভালবাসা না থাকলে এটা হয়? অটলের বুদ্ধিতে বোধে ব্যাপারটা বড়ই জটিল। কোন ব্যাখ্যায় যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। ধোঁয়াটে বোধে সন্দেহটাও অজস্র এলোমেলো বিন্দু কোন আকৃতি নিতে পারে না।

'কী হল ! এসেছি কতক্ষণ। বকনাটার গা থেকে মুখ তুলছ নাই। কাজকম্ম কিছু নাই ?'

অটল চমকায়, 'তুই ! তোর নামে যে হুলিয়া। পালিয়ে যা।'

'হুলিয়াই আসে আর যায়। আমি ঠিক থাকি।' জগার ঠোঁটে সিগারেট জ্বলে। দাওয়ায় বসে বলে, 'জান শাঁখার জ্বর। দেমাক কত। আপেল আঙুর নিয়ে গেলম্, ওষুধের লেগে টাকা ধরতে গেলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বলে, পাপের পয়সার ফল ওষুধ খাবে না।' অসহিষ্ণুতার জ্বালা নিয়ে তীব্র ক্ষোভে জগা বলে চলে, 'টাকা পয়সার আবার পাপপুণ্যি কী। ওতে কী লেখা থাকে। শালা ডাকাতি করতেও হিম্মত লাগে, মাগনা কেউ হাতে তুলে দেয় না, খাটনি লাগে, বুদ্ধি লাগে। আর পুণ্যি করে ধন হয় না। সব শালা ডাকাত।'

'কে ডাকাত কে ভালমানুষ বিচের করার তুই আমি কে। তবে হ্যাঁ বলতে পারি শাঁখা ভালমেয়ে বটে। ভালবেসে দিয়েছিস্ ছুঁড়ল কেনে ? তুই অন্যায়ের ধন এনেছিস্ বলে। গায়ের ঘাম ফেলে খাটনিতে রুজগার কর—ঠিক লিবে।'

'আমি কী আবার রিক্সা টানব। তোমারও দেখছি—হুঁ।'

'রিক্সা টানতে যাবি কেনে ? অন্য কাজও দেখ। তবে রিক্সাটানা কী খারাপ কাজ বটে। যাক গো, ভিন্ন কাজ বলতে পারি। তোর পসন্দ হবে ত !'

জগা সিগারেট টানে। উত্তর দেয় না। তবে শোনার জন্যে অটলের উপর পলকহীন চোখ ফেলে রাখে।

'বড় পুকুরের ধারে কাঞ্চন পাল তালগাছ কেটেছে। গোড়াট পড়ে আছে। মাটি থেকে তুলে দিলে পনের টাকা দেবে। আমাকে বলছিল। আমরা আঠার টাকা চেয়েছি—রাজি। ভোলা আমি—সব বাগালরা আর কী। তা তুই ওটা তুলে আঠার টাকা নিতে পারিস্।'

জগা উত্তর দেয় না। সিগারেট টেনে যায়। চোখ আকাশের দিকে।

'ভাবছিস কী। কাজটতে কুড়ুল কোদাল নিয়ে লেগে যা। পারবি ত ?'

জগা চটে ওঠে, 'খুব পারব। কিন্তু কেনে ? শাঁখার এত দেমাক কিসের। কী ভেবেছে। জ্বর আছে কী না দেখতে কপালে হাত রাখতে পর্যন্ত দেয় না।'

'দেবে—দেমাকও থাকবে না। ওই আঠার টাকা বলবি কী করে পেলি, দেখবি শাঁখা হাত পেতে নেবে।'

'তুমি ওকে চেন না।'

'চিনি বলেই ত বলছি।'

'কিন্তু তোমাদের কাজ আমার নেওয়া ঠিক হবে না।'

'আমাদের কী বাধা। বাগালি ত ছেড়ে দিচ্ছি না। তাহালে চল বড় পুখোর। গরু খুলে আমিও যাব।'

জগাকে যেন জেদে পায়। অটলের কথার মধ্যে এমন কিছু থাকে কিংবা প্রত্যাখানের প্রণয়দর্শিতে চূর্ণ তার দম্ভের গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দেখান সে সব পারে, তাকে মাটির গর্ভ থেকে তালগাছের শেকড় গুঁড়ি তোলার আঠার টাকা উপার্জনের দিকে ধাবিত করে।

অটল খুশী হয়। ভালবাসার মেয়েমানুষের জন্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করে। জগা করবে এটা কী নতুন কথা, সে চিনির জন্যে করেনি। থাক চিনির কথা। একটা ছেলে পেটে নেবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। চিন চিন করে কাটা জায়গায় নুন লাগার জ্বালা। অটল ভাবে, ডলির জন্যে সেও তো অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু মেয়েমানুষ যে তাকে ঠেলে দিতে চায় নরকের দিকে। আহা মানবজীবন বড় মূল্যবান গো। ভাগ্যের কথা। গুয়ের পোকা হয়ে যখন জন্মাওনি, গু ঘাটবে কেন? আর জগা—কে বলে ভালমানুষ ওর মধ্যে নেই? আছে-আছে-দেখা যেত না। এখন দেখ সব। শাখা তাকে ভাল করতে বলেছে। কিন্তু পিরীতের বাণে কাৎ হয়েই তো ভাল হতে হচ্ছে। জগা ভাল হোক। দুনিয়ার সবাই ভাল হোক। আকাশের দেবতার কত কষ্ট। দিনরাত্রির নজর ফেলে রাখতে হয় হাজারো চোখে, বিশ্রাম নেই—তেনার বিশ্রাম জুটবে

জগাডাকাত কুড়ুল ফাবড়া নিয়ে একা একা বড় পুকুরের ধারে তালের গুঁড়ি তুলছে এ এক সংবাদ বটে। লোক জড় হয়ে যায়। কাঞ্চন আসে। তারই কাজ। তা বলে জগাকে দিয়ে করান। বলে, 'আরে তুমি করছ কী জগা! একী তোমার কাজ!' ডাকাতকে ভয় থেকে তার তোয়াজের চেষ্টা। না জানি কোন প্রতিক্রিয়া হয়—তার উপর ফলে যায় আঁধার রাতে। সন্দিগ্ধ সব চোখই। নিশ্চয় এর মধ্যে রহস্য আছে। জগা মুনিষগিরি করার পাত্র নয়, অন্য উদ্দেশ্য আছে। ভিড়টা জগার দাবড়ানিতে মেলা বসাতে পারে না। গোবিন্দ 'এদিকে কাট ওদিকে কাট' বলতে যেমো মুখে জ্বলন্ত চোখ জগা তাকায় শুধু। সাহায্য করতে ফনে এগিয়ে এলে বলে 'সর শালা।' অটল ভোলা বাগালকুল উবু হয়ে বসে দেখে শুধু। জগার গায়ে ঘাম ঝরছে। মাথার রুক্ষ চুল আন্দোলিত হচ্ছে, সমস্ত পেশী থেকে ছিটকে পড়ছে বিদ্যুত। বিশ্রাম নেই, শ্বাসের শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। একটা মানুষ

লড়াই করছে মাটির সঙ্গে, তার গর্ভ থেকে তালের শিকড় গুঁড়ি নয়, অমূল্য কোন সম্পদ বুঝি উঠবে।

অটল ভোলাকে ফিসফিস করে বলে, 'বাজী হার। টাকা দিয়ে দিবি।'

ভোলা বিস্ময়াহত। কথা বলে না।

জগার গুঁড়ি তোলা, আঠার টাকা নিয়ে যাওয়া যেন অটলের চারপাশে এক চমৎকার স্বপ্নের দৃশ্য রচনা করে! সে দিব্যি ভাসে সাদা ফেনপুঞ্জ মেঘের মত। বাধাহীন আকাশ মাটি তারার আলো, চন্দ্র সূর্য এই পৃথিবীর বৃক্ষ লতাগুল্মাদি, দীঘি, নদীর উপর আশ্চর্য মায়াময়তার সে পক্ষ বিস্তার করে। পক্ষের ছায়ায় বর্ষাভেজা হর্ষোৎফুল্লতায় সে এঁকে নেয় জগা শাঁখার এক মধুর দৃশ্য। শাঁখার জ্বরতপ্ত কপালে হাত রেখেছে জগা। মেয়ের শুকনো ঠোঁটে হাসি, শরীরের সব যন্ত্রণা বিমোচিত হওয়ার স্বস্তি! ভোলা বিল্টু পদাইয়ের সঙ্গে বাজীতে জিৎ কিন্তু ওরা মানতে চায় না। তবে তার জন্যে অটল তর্ক করে না। ওরা আরও কাজ দেখবে। দেখুক, অটল জানে সে জিতে গিয়েছে।

সহদেবমাষ্টার ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে অটল, জগা নাকি তোর কথায় ওঠে-বসে। কী মন্তর পড়লি বল দেখি।' জিজ্ঞাসাটা আরও অনেকের। অটল তার নিজস্ব ভঙ্গীতে হাসে।

অটলের অহঙ্কারটা ভেঙে যেতে দেরী হয় না। ভুল তার। লোকের সন্দেহই সত্য! সন্ধেবেলায় জগা আসতে তার ঔৎসুক্যতাতে মুছিয়ে দেয় ওর ক্ষুব্ধ কথা। শাঁখা ভাল আছে! আঠার টাকা নিয়েছে সব শুনে। বলে, 'শাঁখার কথা ছাড় তো! শালা। তোমার কাছে আসছি শুনে ফনে বললে অটলবাগাল মাগী বটে—মাগীর পারা টান আমার তোমার উপর। তা আছে, বুঝতে পারি। তা নাহলে তোমার কথা শুনে তালের গুড়া তুলতে যাই—আঠার টাকার লেগে অত শ্রম করি—শালা। একটা মেয়ের লেগে—।' জগা মদ খেয়ে এসেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভেতো মদের পচানি গন্ধ। পাজামার উপর পাঞ্জাবি, মাথায় রুক্ষ চুল। ক্ষোভের দোলা তার সারা শরীরে।

'ভাল কাজ করেছিস। ফনে ভাল লয়। তোকে কুশিক্ষে দেয়।'

'তুমি সুশিক্ষে দিছ।' জগা বিদ্রুপের টান মারে। তারই ঝনঝনানি নিয়ে বলে, 'তুমিও তো ডলিবৌদির সঙ্গে মজেছ। ফনের উকে টান আছে, মাঝখানে তুমি।'

'ফনের মতলব ভাল লয়।'

'মাগী করবে তার উপর খারাপ ভাল কী। সব বেটারও একই মতলব। তবে

হ্যাঁ আমি তোমার দিকে। অনেকে কবে দিয়েছি উকে আর জ্বালাবে না। তুমি সাঙা কর। আমি আছি।'

'আমার কথা ভাবতে হবে না। তুই নিজের কথা ভাব।'

'ঠিক বলেছ।' মাথা অযথা নাচাতে থাকে বারবার জগা। বলে, 'তার লেগেই আসা। তুমি আমাকে আঠার টাকার কাজ দিয়েছ। আমি দুশো টাকার দুব। বুধবার রেতে তুমি বেরুবে আমার সঙ্গে। ভয় নাই। ঘরে ঢুকতে হবে নাই, খালি মাল সরাবে।'

অটলের গলায় বিস্ময়াহতের আর্তি, 'আবার তুই জেনেশুনে মরতে যাবি।'

'মরাকে আমি ভয় করি'না। একদিন ত মরতে হবেই।'

'তুই মরলে শাঁখার কী হবে।'

'কাজের সময় মেয়েমানুষের'নাম করো না। তুমি যাবে কী না বল।'

'যাব না।'

'বাঃ এদিকে আমাকেকাজকরালে। আমি কাজ করাতে চাইলে—না। বাহা রে বাঃ। দুনিয়া কেমন দেখ।' জগা যেন মজা পেয়েছে।

'মদ খেয়েছিস, ঘর যা। আর বকতে হবে না উলটোপালটা।'

'মদ খেয়েছি, মাতাল লই। বিবি জ্ঞান আছে। জবাব দাও দাদা।'

'তোকে ভাল কাজ বলেছি। তুই আমাকে অন্যায় করতে বলছিস্।'

'তুমিই ত বল, ন্যায়-অন্যায় বিচের করার আমরা কে! কাজ ত বটে।'

'আমি তক্ক করতে পারব না।' বলেই অটল নীরব হয়ে যায়। কী বোঝাবে সে মাতালকে, ডাকাতকে। ভালমানুষ গড়ার আনন্দটুকু বর্ষার এই সন্ধ্যা কেড়ে নিয়ে দুঃখের হাহাকারে ভরিয়ে দেয়।

জগা কত কী বলে যায়। মানুষের উপর, এই পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ তার, কোথাও শান্তি নেই, কেউ তাকে বোঝে না, অটলও বুঝতে চাইছে না ইত্যাদির শেষে বলে, 'ঠিক আছে। আমার অন্য কাজ বার।' নিচু খাদে গলা রেখে বলে, 'তোমার কাছে কিছু টাকা কিছু জিনিস রাখব। কখন কী হয় বলা যায় না। ধরা পড়লে জেলের ঘানি টেনে এসে তোমার কাছে লুব। আমি জানি তুমি সবকিছু ঠিক ঠিক ফেরত দিবেই।'

'আমি কিছু রাখবই না।'

'আমি মরলে সব তোমার হবে। ফিরে এলেও ভাগ দুব। উঁহু, ফেরার আগেই তোমার ভাগ। বুঝলে ইবার ডর লাগছে।'

পিতৃপ্রতিম স্নেহে অটল বলে, 'ডর লাগলে তু যেছিস কেনে জগা।'

'আমি কী যেছি, আমাকে যেতে হছে। যাক্ শুনে, তুমি নতুন সংসার পাতবে, ঘর করতে হবে, চালে খড় লাগবে। বৌয়ের পিছাতে খরচ আছে। তুমিও বৌকে তো সুখ দিতে চাও। আর ডলিবৌদিকে তুমি পাবেই।'

'তুই ভালমানুষ হ। তারপর তোর সব কথা শুনেব।'

জগা এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দাওয়া থেকে ছিটকে পড়ে উঠোনে, 'কোন শালা ভালমানুষ! গরীব বড়লুক দেবতার লীলা? দেবতার কাজকম্ম নাই। সবাই মায়ের পেট থেকে নাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে আসে, রাজা ভিখিরি সব—ভাবাদে মানুষ শুষে বড়লুক হয়। আমি উদের ঘরে ডাকাতি করি—কী অন্যায় করি। অটল-বাগাল তুমি আমার মাথা খারাপ করে দিছ। শালা, খুন করতে পারলে তুমাকে শান্তি পাই, খালি নাচাও খালি জ্বালাও শাখার পারা। দুই ই সমান। বেঁধে আমাকে মারছ। পালাতে পারছি না, ঘুরে ঘুরে আসছি।'

সন্ধের আঁধার ঘনছে, আকাশের নিঃশব্দ নক্ষত্রকুল, নিঃশব্দ গ্রাম, বাতাসের অদৃশ্য তরঙ্গ কাঁপান স্বরপাতে সে ঘূর্ণিঝড় গড়ে নেয়। মদের নেশা কেটে গিয়েছে। তারপর ঘূর্ণির মতই বেরিয়ে যায়।



বৃষ্টি। বৃষ্টি। সূর্যহীন দিন কৃষ্ণমেঘ ঘনতায় অবিরল কান্নাধারায় ভাসে। অফুরান প্রকৃতি ম্লান। খড়ো চাল বেয়ে জল নামার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় না, গাছের পাতা ঝরানি থামায় না, ঢালু জমির জল নামা থমকায় না। ছেঁড়া ছেঁড়া নিচু সব জমিই জলাভূমি, তারমধ্যে চাষের কাজ, চাষী ক্ষেতমজুর চরম ব্যস্ত, সংসারের অন্য কাজ মুলতুবী। সদয় এবার দেবতা। পাথুরে জমিতে অতি বর্ষণ শুভ ফলদারক, আগামীর সম্ভাবনাকে সোচ্চার করে। এ সময় গবাদি পশুর চারণভূমি হয় অচাষযোগ্য ডাঙা জমি। বাগালকে নজরদারি বাড়াতে হয়। আফুড়ে বা বীজতলা গড়ে উঠছে। সবুজের ডাক—অবলা জীব ছুটে যাবেই। গেলেই খোঁয়াড়, জরিমানা। গরু নিয়ে বর্ষায় হুজ্জোত বটে। এই তো কাল থেকে আকাশ মুহূর্তের জন্যে নীরব নয়। ডাওরের দিন চলছে। বৃষ্টি বিরক্তিতে গরু ছাগল ঘাসে মুখ লাগাতে পারে না। সব গোয়ালবন্দী হয়ে আছে। বিকেলের দিকে একটু চকশা করতে অটল গরু খোলার কথা ভাবে। ভোলা এসে আপত্তি জানায়, 'ছাড় তো। বেলা আর আছে নাকি। গরু খুলে নিয়ে যেতে যেতেই সন্ধে। আকাশ ছাড়ুক, কাল সকাল সকাল খোলা হবে। রাঁধাবাড়া করলে?'

'সকালে খিচুড়ি করেছিলম। একরম সুস্বাদ হয় নাই—পড়ে আছে। রেতে উটই খাব।'

'বড় পুখোরে মাছ বেরিয়ে গেইছে ভাসানে। সবাই ধরেছে। মা যেতে দিলে নাই। জ্বরে ভুগলম ত দুদিন। ধরেছ মাছ?'

এ সময় এক উপার্জন হতে পারত বটে মাছ ধরা। মাঠে খালে পুকুর ভাসান মাছ। কিন্তু খদ্দের কোথা। গোপালপুরের বাবুপাড়ায় জলের দামে দিতে হয়। নিজেরা খাবে; তা তেল চাই, উনুনের কাঠ চাই, মশলা চাই। বর্ষায় কাঠ ভেজা, অন্ন ব্যবস্থা হলেও উনুনে ধরাতে চোখে জ্বালাবাবি নামে। অটলের মাছে আগ্রহ নেই। বলল, 'যা ডাওর উনুনে হাত পা ঢুকিয়ে মরা আগুন জাগিয়ে রাখতে হয়, ভাত ফুটুতেই কাহিল, তা মাছ—।'

'জগা এসেছিল ?'

অটল চমকায়। সে বড়ই ভয়ে ভয়ে আছে। ডাকাতিতে যাবার কথা, তার কাছে টাকা গয়না রাখার কথা বলায় সেই সন্ধ্যার পর আর দেখা করতে আসেনি। আসার জো নেই। রামপুরে ঘোষালডাক্তারের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে প্রহ্লাদের পা গিয়েছে, ফলে ধরা পড়েছে। আধমরা করে দিয়েছে ওকে। জগা তারপরই ফেরার। ডাকাতির পর পুলিশ কুকুর এসেছিল রামপুরে। ধরা অবশ্য কেউ পড়েনি। কোন মালও পাওয়া যায়নি। কিন্তু থানায় জগাকে ধরার খুবই তোড়জোড়। সদরে ঘোষালডাক্তারের কত প্রভাব প্রতিপত্তি, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ভাবসাব। জগা ধরা পড়বেই।

অটল ব্যগ্র প্রশ্ন করে, 'জগার খপর আছে ?'

'খপর থাকলে তোমাকে শুধোই। রাতবিরেতে তোমার ঘরে ঢুকতে পারে। খুব সাবধান। তালের গুঁড়া তুলাতে বললে ভাল হয়েছে ? হুঃ, ভাল হবে তাহালেই হয়েছে আর কী।'

'নিজেই মরছে—ধরা পড়লে ত দ্বীপ চালান।'

'শালার আর বাঁচার পথ নাই।'

অটল বুঝতে পারে না শুনে তার কেন কষ্ট হয়।

'বেটা ঠিক বেহারে পালিনু ছে। না, সন্ধে হল, ঘর যেছি।'

'হ্যাঁ জ্বর থেকে সবে উঠলি, সাবধানে থাকতে হবে।'

ভোলা চলে যাওয়ার পর অটল নীরবে বসে থেকে। জগা কারও কথা শুনল না, আবার ডাকাতিতে গেল, তবু কেন যে এত উদ্বিগ্নতা ওকে ঘিরে, এখনও কেন যে ওর মঙ্গল চাইছে, কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। অটল টের পায় না—সে ভালবেসে ফেলেছে।

চকায় রাত্রিবেলায় নাকি জগাকে ধরার জন্যে নিঃশব্দে পুলিশ ঘোরে এখন। মালতীর ঘর এসেছিল, হম্বিতম্বি করে গিয়েছে দু'দিন। তার ঘরে পুলিশ আসবে অটল এটা কখনও ভাবেনি। জিপগাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটবাবু সঙ্গে চার বন্দুকধারী। খাঁকি পোষাকের কোমরে চওড়া বেল্ট, রিভলভার, মাথায় টুপি, ভারী চেহারার ছোটবাবু। দু' চোখ জ্বলা, টান টান কাঠামো। অটল গাই দুইতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গাড়ি, পুলিশ দেখে সবাই কাজ ছেড়ে অটলের উঠোনে। প্রশ্নহীন, বিস্ময়ভরা চাউনি। তো মানুষজন নয়, পুলিশ দেখেই অটলের হৃৎপিণ্ডে ভয়ের ফাটল, তাতে হু হু বাতাস বেরিয়ে সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

'তোমার নাম অটল ?'

অটল মাথা নাচায় ।

'যেঁড়ো জগা কোথা ?'

'জানি না ।'

ছোটবাবু খিচিয়ে ওঠেন, 'জানিস্ না কী। তোর ত স্যাঙাত। আমরা সব খবর রাখি। তোর কাছে কবে এসেছিল ?'

'ছেক দিন আগে।'

'ঘোষালডাক্তারের বাড়ি ডাকাতির পর তোর কাছে কী কী রেখেছে বার কর।'

'কিছু রাখে নাই।'

ছোট দারোগা দাবড়ে ওঠেন, 'মিথ্যে কথা।'

'আমি মিথ্যে বলি না।'

'বুদ্ধিশুদ্ধি আমার। ঘর সার্চ হবে তোর।'

পুলিশ ঘরে ঢোকে। টিনের বাক্স, মাটির হাঁড়ি, তালাই এলুমিনিয়ামের থালা বাটি গ্লাস, ওদিকে কাঁথার পুঁটলি। পুলিস আছড়ায়, বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে থালা বাটি। শুধু ওরই শব্দ, জনতা স্তব্ধ, ছোট দারোগা নীরব, অটলকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন। অটলের দু চোখে অসহায়ত্ব, শব্দহীন, জীবনেরও বুঝি সাড় নেই।

পুলিশ দুজন বেরিয়ে আসে, 'কিছু নেই স্যার।'

'এই কোথা পুঁতে রেখেছিস্ ?'

অটলের মুখ দিয়ে ভয়ার্তস্বর বেরিয়ে আসে, 'কী।

'ন্যাকামো হচ্ছে।'

'স্যার, মুখের কথাতে হবে না। দেখুন—।' বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পেটে আচমকা ঘা দিতেই অটল আর্তির শব্দ করে পড়ে যায়।

'আমি কিছু জানি না বাবু।' অটল ঘষটে ছোটবাবুর সবুট পা ধরতে যায়।

ছোটবাবু বুট সমেত পা দিয়ে ঠেলে দিলেন। উল্টে পড়ল অটল। বিশাল হয়ে উঠল তার চক্ষুদ্বয় খাঁকি পোশাক, বেল্ট, পেতলের তকমা, অগ্নিউদ্গারী রিভলভার, রক্তাক্ত চোখ, শক্ত চোয়াল, পুরু ঠোঁটের গুঁফো মুখ সবই জিঘাংসাপূর্ণ। টের পেল বুকের উপর ভারী পায়ের চাপ। আতঙ্ক বিহ্বলতায় রক্তহীন, প্রাণশক্তি শেষ বিন্দুতে পদ্মপত্রে জলের মত টলয়মান, প্রবল শ্বাসকষ্ট, পাঁজরা মট্‌মট্ করে কাঠির মত ভেঙে যাবে, তারই শব্দ শোনার বর্ধমান চাপের যন্ত্রণা উন্মুখতা, আকাশ নেই বাতাস নেই

শব্দ নেই, ভয়ঙ্কর বৈত্যমুখ নামছে, চাপ দিচ্ছে। অটলের পেট থেকে বুঝি নাড়িভুঁড়ি গলার দিকে শুধু বেরিয়ে আসতে চায়।

'বল্। বল্ কোথায় পুঁতে রেখেছিস্।'

আরশোলার মত উলটে খাওয়া শরীরে বুট পা, অটল মাথা শুধু নাড়ায়। মুখ হাঁ, বিস্ফারিত চোখে বমন অনুভূতি।

ভিড়ের ভেতর থেকে ডলি বেরিয়ে আসে আলুলায়িত চুলের ঝটিকা হয়ে। বিশাল ডানায় চঞ্চুর কঠিন আঘাত হানার আক্রোশ নিয়ে ধাক্কা মারে ছোটবাবুকে। চেঁচিয়ে ওঠে, 'ছাড়। ছাড়। মানুষ নাকি শুয়োর বট।'

ছোটবাবু ডলির দিকে ঘুরে দেখে। গায়ে ডোরা শাড়ি, দু' চোখ আগুন, মেয়েমানুষ যেন সাপিনীর মত হিসহিস করছে, চেরাজিভ ঝুলছে, ছোবল মারার জন্যে টান টান বিদ্যুত রেখা, খড়ম ছাপ রঙীন ফনা। ছোটবাবুর ভয়ের প্রচ্ছন্নতা স্বরে, তুই আবার কে?'

'দারোগা বলে মাথা কিনেছে। উ চুর না ডাকাত বটে।'

'সরে যাও। সরে যাও এখান থেকে।'

'সরব কেনে? সরব আর মারবে?

'কে হয় অটলের? অত দরদ।' ছোটবাবু প্রশ্ন রাখেন স্তম্ভিত জনতায়।

জনতা নীরব। পরস্পরের মুখ দেখে। ডলি বলে, 'যেই হই। অন্যায় মারবে। শুধোন গাঁয়ের লুককে, গুপালপুরে যান, মানুষ ই কেমন বটে সবাই বলবে।'

জনতার প্রতিক্রিয়া পরস্পরের মুখ দেখা।

'কী গো সব যে মুখে কুলুপ এঁটে নাথ্য কথা বলতে পার না।'

ভোলার মা বলল, 'বুন ঠিক কথা বলছে। জগা ডাকাত বটে, ই ভালমানুষ।' সঙ্গে সঙ্গে জনতার সোরগোল, 'ভালমানুষ', 'বাগাল', 'জগা যদি আসে উর কাছে ওর কী দোষ।' ওদিক থেকে সরলাবুড়ি বলে, 'ডাকাত ধরার মুরোদ নাই, ভাল মানুষকে টানাটানি'। যেন জনতা কথা ফিরে পেয়েছে। পুলিশ ভয় কাটতেই সবাই বলতে চায় একসঙ্গে।

ছোটবাবু পা ঠোকেন, 'চুপ কর্। চুপ কর্ সব। চল্ থানায়।

ডলি ঘিরে দাঁড়ায়, 'না যাবে না।'

ছোটবাবু আর সাপিনী দেখছেন না, প্রতাপ চিড়বিড় করছে খাঁকি পোশাকের ভেতর। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন, 'তোরও যেতে সাধ হয়েছে।'

'সাধ না হলেও ত নিয়ে যান।'

'কে তুই ?'

'আবার কে ? মেয়েমানুষ বটি। ইখানে না দাঁড়িয়ে জনাকে খুঁজুন। ধরার মুরোদ নাই, খালি ভালমানুষের উপর তড়পানি।

একজোড়া সাইকেল আসে সরু রাস্তাটায়। পঞ্চায়েত সদস্য গোপীনাথ আর প্রধান অবিনাশ। গোপীনাথের পাজামার উপর শার্ট, রোগাটে চেহারা, বি এ পাশ করেছে, নিজের জমি চাষ করে, কালো মুখে সরু করে কামান মুখ। অবিনাশ প্রায় পঞ্চাশ, গোলগাল চেহারা, তামাটে বর্ণ, সম্ভ্রম আদায়কারী টাক, ওল্টান কাঁচাপাকা চুল, মুখে গালে লাবণ্য এবং প্রসন্নতা আছে। আগামী নির্বাচনে বিধানসভাতে দাঁড়াবে তার জমি প্রস্তুত করছে।

'আরে ছোটবাবু—আপনি—কী ব্যাপার।'

ছোটবাবু এবার দারোগাসুলভ ভঙ্গী ফোটান, শাসনকর্তা, সরকারের বাঁধা মানুষ নির্বাচিত প্রতিনিধি তো ফুটুস্ হতে পারে—বিগলিত হন না মোটেই, 'আবার কী। এই আপনার জনতা।'

'কী করল জনতা ?'

'মানুষগুলোকে এমন করে দিয়েছেন। কথায় কথায় এখন বিপ্লব করছে।' ছোটবাবু অভিযোগ নয় হাসির মোড়কে তিক্ততা ফোটান, 'আসামীকে নিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছে।'

'আসামী ? কে আসামী ? ডাকাতির ?'

'এই যে।' ডলি চুড়িপরা নিটোল হাত বাড়িয়ে অটলকে দেখায়।

গোপীনাথ বলে, 'সে কী অটল কেন ডাকাত হবে। ভুল করছেন ছোটবাবু। ও কোন অধর্মে থাকে না। ওর তো কথায় কথায় বাতিক ধম্ম আছে বলা। না, না। আমি চিনি ওকে।'

'মানুষ চেনা কী অতই সোজা। ওর নাম পাওয়া গিয়েছে। ডাকাতিতে না থাকুক শেল্টার দেয়। একটু কড়কে দেখছিলাম্ দেওতো জগার সন্ধান যদি পাই।'

অবিনাশ বলল, 'তবে যে বললেন জনতা বাধা দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওই কড়ানি দিতেই তো—।'

অবিনাশ ভিড়ের দিকে চোখ রেখে বললে. 'আরে বাবলা তুই অতদূরে। কী হয়েছে। তুই এক মেম্বার—। ভোট দিয়ে তোকে দাঁড় করিয়েছে।'

বাবলা এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'শুনেই তো এসে দেখি ছোটবাবু অটলের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ডলিবৌ ভাগ্যিস্ রুখল।'

অবিনাশ ভ্রূতে বিস্ময় রেখা নিয়ে বলে, 'সে কী ছোটবাবু, আপনি মা কালী হয়েছিলেন, অমন নির্দোষ একটা মানুষকে শিব করে।' মাথা দোলায়, 'পাবলিক তো এটা মেনে নেবে না। জগাকে নিয়ে যা খুশী করুন—কিন্তু অটল ধর্মভীরু, শান্ত, ভালমানুষ। বুঝলেন এ সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। প্রশাসনে আমরাও রয়েছি।'

ছোটবাবুর সম্মানে লাগে। রাজনীতি দেশের বারটা বাজিয়ে ছাড়ল। ডাক্তার বাড়ির ডাকাত ধরাটা তার কাছে চ্যালেঞ্জ। সহজে কথা বলতে চায় না, তাই সামান্য কড়কানি প্রয়োগ করতেই হয়। নইলে শাসন থাকে না। ঝাপটা সামলে বলে, 'আপনারাও যদি এরকম কথা বলেন, হেলপ্ না করেন।'

'হেলপই তো করতে চাই। যাক্‌গে কী করতে চাইছেন?'

'একে থানায় নিয়ে যাব। চাপ দিলেই সব বেরিয়ে আসবে।'

ডলি চেঁচায়, 'না যাবে না। থানাতে মারবে তুমরা। আমি জানি।'

'আঃ চুপ কর।' অবিনাশ হাত তুলে আশ্বস্ত করে, 'শোন তোমরা, একজনের জন্যে চকা গোপালপুরের বদনাম হচ্ছে। নিরীহ মানুষকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। জগার সন্ধান পেলেই তোমরা আমার কাছে জানাবে, কিংবা থানায় চলে যাবে। গাঁয়ে এলে সবাই মিলে বেঁধে রাখবে। ছোটবাবু, আমি যখন এসেই পড়েছি ওকে ছেড়ে দিন। জগা ওর কাছে আসত ঠিক কথা—আমিও জানি। দুজনের সম্পর্কে হলেও আমি বলতে পারি ওরা এক হয়নি।'

ভোলা বলল, 'অটলকা বাজি রেখেছিল জগাকে ভাল করবে।'

'দেখলেন তো! কী অটল ঠিক বলছে?'

'আজ্ঞে—উকে বলতাম—ডাকাতি ছাড়।'

'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আর বলতে যেও না।'

অটল কথা বলে না। এ কেমন কথা। মানুষকে সে ভাল হতে বলবে না। না, প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় না। ঘটনাটা এখনও হৃৎপিণ্ডে তুমুল শব্দ বাজাচ্ছে, বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, বমিভাব এখনও যায়নি। সে অসহায় চোখে শুধু তাকায়।

'চলুন ছোটবাবু পঞ্চায়েত অফিস ঘরে চা খেয়ে যাবেন।'

'না। আমাকে থানায় ফিরতে হবে।'

'আরে চলুন। জগাকে আপনার হাতে তুলে দেবার দায়িত্ব নিচ্ছি।'

'শুধু কী জগা? আরও আসামী রয়েছে।'

'আপনি নামগুলো দেবেন।' অবিনাশ এবার বাবলাকে দেখল, 'হ্যাঁরে বাবলা ডি আর ডি এর নেক্সট অ্যালটমেন্টে চকার কেন কার কার নাম আছে।' অটলের বুকে আঙুল বাড়ায়, 'এর নাম আছে ত !'

বাবলা বলল, 'আছে। টাকা পেতে ত ঢের দেরী।'

'বলেছিস্ একে ? বলে দিবি বুঝিয়ে।' অবিনাশ অটলকে বলে, 'শোন ডি আর ডি এর টাকা পাবে। গাই কিনবে ছাগল কিনবে। ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করলে অনুদান তোমার। আর ওই জগার ঝামেলায় থেকো না। চলুন ছোটবাবু।'

অটল চুপ করে থাকে। ঘাড় কাতও করে না।

উঠোন ফাঁকা হয়ে যায়। রোদ পড়েছে। আকাশে মেঘের টুকরোও নেই, কিন্তু পশ্চিমের দিকটা কালো। কাল বৃষ্টি ছিল না। অন্য সময় হলে ঘটনার পর চকার মানুষজন উঠোন ভর্তি করে প্রতিক্রিয়ার্জনিত বক্তব্যে মশগুল হত। চাষের তাড়ায় গুরুত্ব পায় না ঘটনাটা। ভোলা দাঁড়িয়ে আছে। আর ডলি। সে যেন এখনও রাগের তাতান পাচ্ছে। চোখে জ্বালা, স্বরে তীক্ষ্ণতা, 'হু মরণ আমার। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ, জেনেশুনে স্যাঙাত করলে, কেমন তার ফল, শেষ করে দিত পুলিশ, হাজতে ভরে হাড়মাস এক করত, কোন বাপ বাঁচাত তোমাকে ? ভাল হয়েছে, এবার যদি শিক্ষে হয়।' একটু থামে, 'ডাকাত ভাল করবে, তোমার কী, নিকেশ হলেই ত শান্তি।' ডলির অক্ষিগোলক বিস্ফারিত, সব উদ্গার হবার পক্ষে এক মুখ যেন যথেষ্ট নয়, আরও কয়েকটা মুখ থাকলে স্বস্তি পাওয়া যেত। বলে, 'ও বাবা ভোলা, দেখ ওর হাড়গোড় ভাঙল কী না !' তারপর নিজেই জিজ্ঞেসা করে, 'বাজছে নাকি ?'

অটল দাওয়ায় বসে বলে, 'না।'

ভোলা বলল, 'ভাগ্যিস্ তুমি রুখে দাঁড়ালে।'

'না দাঁড়ালে, তোর এই কাকা কী মানুষ বটে।'

অটল বলল, 'হ্যাঁরে ভোলা বেলা হচ্ছে গাই দেখি গা, গরু খুলা আছে।'

'একটু বস। তাবাদে যাবে।' দাবড়ানি দেয় ডলি।

'হাঁ। বস। গরু দেখতে আমি যাচ্ছি।' ভোলা আর দাঁড়ায় না।

ঘরে বালতিতে জল ছিল। ডলির কথাতে অটল মুখ-হাত ধোয়। তার মধ্যে সারাঘরে ছত্রখান হয়ে যাওয়া সামগ্রী গুটিয়ে রাখে ডলি।

ঘরের জিনিস গুটিয়ে ঝাটপাট দিয়ে ডলি বলে, 'হাঁ গো বাজছে নাকি বুকে ?'

ডলির স্বরে মমতা। উত্তেজনার মুহূর্তটি পার হয়ে আর্দ্র হয়ে উঠেছে তার

বুক। দু চোখে জ্বালার বদলে কষ্টের অনুভূতি, যে কষ্ট প্রিয় মানুষের জন্য হয়। ডলি ভাবে না, অটল তার কে। সেদিন রাতের অগ্রাহ্য তার শরীরের অপমান, মনে থাকে না। মানুষ শুধু ভালবাসার প্রত্যাশা করে না, ভালবাসা দানেও সমান আগ্রহী হয়।

'না। বাজে নাই।' অটল জড়িতস্বরে মাথা নাড়া দেয়। বিহ্বলতার কুয়াশা যেন কাটছে না, মাথা ভার, ঘরের উঠোন অস্বচ্ছ। ঘটনায় তার ক্রোধ নেই পুলিশ ভূমিকায়। জগার উপর মমতা তাকে সঙ্গ দান, গল্প করা, ভালমানুষ করার ঈপ্সার অনুতাপ নেই—ঘটনার বিমূঢ়তা শুধু। তার মধ্যে ডলি অসামান্য আলোক-সম্পন্না হয়ে অঢেল দীপ্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছে, নতজানু হয়ে বন্দনার জন্য আকুলিত হচ্ছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়। নিরুচ্চার ওষ্ঠে তারই কম্পন জাগে!

'এখনও ডর লাগছে। এ মা।' ডলি এবার হাসে।

অটলের কান্না পায়। জননীর ছায়া যেন ডলি, অটলের আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করে।

'চা খাবে? করে দুব?'

'না। আমাকে বেরুতে হবে—বেলা হছে।'

'যাবে এখুন! চারিদিকে চাউর হয়ে গেইছে পুলিশ মারধোর করেছে তুমাকে।'

'ভাগ্যিস্ তুমি এলে।' কৃতজ্ঞতায় অটলের মাথা নত হয়। বুক ভাঙা জল আসে চোখে। বলে, 'ছেলেটা কোথা?'

'মন্দাপিসির কাছে। খুব ন্যাওটা উর। তা চা খাবে না।'

'গাই দুইতে গেলেই চা পাব। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

'যা চোখমুখের অবস্থা তোমার, এক গ্লাস গরম দুধ খেলে ভাল হত। কোথা পাব।' ডলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, 'তোমার জন্যে কেনে যে আমার এত কষ্ট হয়। অমন কাণ্ড দেখে মাথার ঠিক থাকল না। সব্বাই চুপ করে। তখন কী করি, নিজের মানের কথা, লাজের কথা, লোক হাসির কথা মাথাতে এল নাই। মনে হল থালভরা যেন আমারই বুকে পা দিয়েছে। গাঁয়ের মানুষ ইবার ঘোঁট পাকাবে। নানা কথা বলবে।' ডলি বলেই কাঠিন্য এনে ফেলে, 'বলুক। আমি কাউকে পেরোয়া করি না।'

'কী বলবে। সবাই বলবে ভাল করেছ।'

'সামনে। পিছাতে—? তুমি আমার কে বট?'

অটল কথা বলে না, চোখ তোলে না। ডলি কী চায় সে জানে, সে কী চায় ডলি জানে, অথচ কেন যে ব্যাপারটা বৃষ্টিধোঁয়ার ঢাকা থাকে, মেঘ মুছে রোদ

ওঠে না। এখন বলার ব্যাকুলতা তার নিচু ঘাড়কে ঝাঁকিয়ে তুলে দেয়।

ডলি হাসছে, 'কিছু বলবে ?'

অটলের ঠোঁট নড়ে না।

'আমি জানি তুমি কী বলবে। চলি, কাজ পড়ে আছে ঢেক। তুমিও গাই দুইতে যাও।' বলতে বলতে সোজা হেঁটে যায় ডলি, পিছন ফিরেও দেখে না।

অটল ডাকার চেষ্টা করে, স্বর বের হয় না

ডলির দৃপ্ত প্রতিবাদী ভূমিকাটিতে চকার মানুষ কম তাজ্জব হয়নি। পুলিশ এমনিতেই ভয় উদ্রেককারী, শব্দের মধ্যে গম্ভীর বলবান একটা অস্তিত্ব যা চাক্ষুষ করা যায়, যত না কর্মধারায় তত গল্পে—স্বাধীনতাপূর্ব ইংরেজ শাসনের প্রেতভূমিকা যেন বহমান। গণতন্ত্র, সবাই রাজা, দেশ আমাদের, স্বাধীনতা, ভোট ব্যবস্থা, ভোট মূল্য প্রভৃত কিন্তু অস্তিত্ব বলের সকর্মতা অনুভবে নেই। পঞ্চায়েতের ভূমিকা, মিছিল, মিটিং, বক্তৃতা, কংগ্রেস, সি পি এম, বি জে পি, নির্দলে দোলায়িত, কিন্তু শিক্ষার অগ্রসার সচেতনতা নামক ব্যাপারটাকে প্রকৃতি দিতে পারেনি। ভাঙা বিকৃত স্বার্থান্ধ অবুঝ, অচেতনের হুঁশহীন জাগর। তো পুলিশ, খাঁকি পোশাক, বন্দুক, টুপি, শামুকের মত গুটিয়ে দেয় সবাইকে। সেই পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়ায় যে মেয়েমানুষ, সে যে সাঙ্ঘাতিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিস্ময়ই অটলের সঙ্গে সম্পর্কের বৈধতাকে যেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখার জন্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মেয়েরা গালে হাত চোখ বড় বড় করে পরস্পরকে বলছে, 'মাগীর ডর নাই, তুকে যদি বেঁধে নিন যেত' 'ভাগ্যিস পেধান এল,' 'মজেছে—ভিতরে ভিতরে কী কাণ্ড ঘটছে, মাগো,' হাসাহাসি প্রেম রহস্যের শরীরী ভূমিকার ইঙ্গিত এবং শব্দের মোচড়ে প্রবৃত্তি সুখ। পুরুষের কথা, 'ভাগ্যিস মাগী রুখে দাঁড়াল, তা নাহালে ভালমানুষ হাজতে পচত,' 'বিটা ছেলের উপরে যায়।' এ বলার পরও ওই নারীর লজ্জাজনক কামপ্রবৃত্তি অটলে সুতরাং ছ্যা ছ্যা যোগ্যও—উচ্চারিত হয়।

চকার নিয়মে বিয়ে সাঙা না করে নারী পুরুষের গোপন সম্পর্ক সমাজ-বিরোধিতা। আগে ধরা পড়লে বিচার জরিমানা হত। এখন কানাই বাগদী যদিও মাননীয়, তার দাপটই ছিল বেশি, অসুস্থ, চোখে কম দেখে। পঞ্চায়েত গুণে বাবলার এ দায় নেওয়ার কথা। সামাজিক শাসন, চুরিচামারি, গৃহবিবাদে মধ্যস্থতা। কিন্তু বাবলা বড়ই মুখচোরা ভোটে যেন ধরে দাঁড় করান হয়েছে। রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও নেই। প্রধান অবিনাশকে এ পুতুল নিয়ে বড়ই কষ্ট ভোগ

করতে হয়।

ডলির বিচার হোক। সাঙা করুক ডলি অটলকে, সমাজকে জানাক, পাত পড়ুক অর্থাৎ ভোজ হোক, মদের হাঁড়ি আসুক—এ রকম চকার মনে থাকলেও মুখে বলার সাহস নেই কারও। যেমন সাহস নেই যে'তো জগার কুকীর্তির বিচার করা। এখানে ভয় নয়, ডলির পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস বাধা, অটলের সুনাম বাধা, চাষের জো'তে চরম ব্যস্ততায় শরীরপাতে ক্লান্তি অবসরহীনতা বাধা। ফলে বিষয়টি আর প্রকাশ্যে আসে না।

ভুলো গরু চরানর সময় একদিন বলল, 'ডলিকাকী তোমাকে খুব ভালবাসে।'

'কে বললে ?'

'বলবে আবার কে ? আমি কী ছোটছেলে বটি—বুঝি না।'

'ওঃ কত যে বুঝিস্।' সুখ আভাসিত হয় অটলের মুখ।

'তুমি সাঙা কর।'

'কী যে বলিস্। রুজগার কুথা ?'

'হাত পুড়িয়ে খেছ। ঠিক চলে যাবে দেখবে।'

চলে তো যাবে, অটল ভাবে, সাঙা করতে গেলেই তো জগা খুনের শর্ত। তবে হ্যাঁ, সেদিনের পুলিশি ঘটনার পর ডলি বুঝিয়ে দিয়েছে শর্তকে সে নস্যাৎ করে দিতে পারে। তারদিক থেকে সাড়া একটু বেশি করে দিলেই গড়ে উঠতে পারে নতুন সংসার নতুন জীবন।

অটল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুইও আমাকে খুব ভালবাসিস রে ভোলা।'

গোপালপুরের নিচুপাড়ার বটতলায় ধীরের মা বসে। স্বামী হারিয়েছে অনেক আগে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল নলহাটিতে। সে মারা যাওয়ার পর জামাই আবার বিয়ে করেছে। ছোটছেলে দুর্গাপুরে কণ্ট্রাক্টারের কাছে কাজ করতে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। শোনা যায় ওখানেই সংসার পেতেছে। ডাকাতি মামলার আসামী ধীরে ফেরার হবার পর বুড়ীর ভিক্ষে সম্বল। কিন্তু কে রোজ দেয়। রোগা কালো এক মুঠি পাকা চুলের হাড় সর্বস্ব মেয়েমানুষের এখন হা-অন্ন দিন। ময়লা ধুতিতে প্রায় কঙ্কাল, জ্বরে ভুগে হাঁটার ক্ষমতা নেই, দিনরাত ঝিমোয়, ক্ষুধায় বিড় বিড় করে। পুকুর এসেছিল, তারপর বটতলায় বসেছে। হেঁটে ঘর পর্যন্ত ফেরার ক্ষমতা নেই। রাস্তায় যারাই পার হচ্ছে তাদেরই আকুতি মিনতি জানাচ্ছে ঘর বরাবর করে দেবার জন্যে। ডাকাতের মায়ের কেউ হাত ধরতে চায় না। তকতকে

রোদ, বর্ষা পরিমণ্ডলে চতুর্দিকে জল-কাদা, বটতলার চাপড়া ঘাস, পোকামাকড়, আশপাশে ব্যাঙ, গঙ্গাফড়িং লাফ মেরে ফিরছে, দু'ধারে ঝোপ, আঁকড় আতার গাছে অতি শীর্ণ পথটা কাদাটে।

'অ বাপ আমাকে ঘরবাগে করে দে। চলতে পারছি না। অ বাপ।'

শুনে অটল ব্যস্ততার সঙ্গে হাত ধরে, 'আহা হা তুমি জলকাদাতে বসে পড়েছ।'

বুড়ী হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়, কাঁপছে, বলে, 'কী করব। যেতে পারছি নাই।'

'এলে কেনে ?'

'একবার পুখোর বাগে যেতে হবে নাই। কে বট ?'

'অটল। চকার।'

বুড়ী চিনতে পারে কী না কে জানে। বলে, 'অ। ধরে পার করে দে বাপ।' দু'পা হেঁটেই বলে, 'কাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নাই। অ বাপ খেতে দিবি।'

আহা কাল থেকে খায় নাই, অটলের ভারী কষ্ট হয়। বলে, 'ঘর চল। দেখি কিছু যদি ব্যবস্থা করতে পারি।'

'বাঁচা বাপ। কেউ দেখে না, কেউ কথা শুনে না, পোড়া পেটের লেগে মরি।' বুড়ী একজনকে পেয়ে সব আবেগ ঝরাতে কেঁদে ফেলে।

'কেঁদ না। বলছি ত—আমি দেখব।'

ঘরে পৌঁছে দোকান থেকে মুড়ি এনে দেয় অটল। খাবার জল এনে দেয় মাটির কলসীতে। আশ্বস্ত করে, সে এবার দেখবে, খাবার এনে দেবে। পড়শীরা চোখ বড় বড় করে দেখে গাংঠিপালের বাগালকে। কোন কথা বলে না।

একদিনই নয়, তারপর গোপালপুরে গাই দুইতে এসে গেরস্তঘরে সে যে চা রুটি পায় বুড়ীকে দিয়ে আসে। ঘরের রান্না করা ভাত পৌঁছায়। এ খবর অবশ্য ছড়াতে দেরী হয় না। গরু চরাতে গিয়ে ভোলারা নিষেধ করে।

ডলি বিকেলবেলায় ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে মাথায় মাথালি নিয়ে এসে বলে, 'লাজলজ্জে কিছু নাই—তুমি ধীরের মাকে খেতে দিতে যেছ।'

'যেছি কী আর সাধে। রাস্তায় পড়েছিল। কেউ তুলে না।'

'কেউ তুলে না ত তুমি তুলতে গেলে কেনে। বলবে না লোকে এদিকে জগার সঙ্গে ভাব, ওদিকে ধীরের মাকে দেখা—তুমি ডাকাতদলে আছ।'

'লোকের বলা দেখলে হবে।'

'বাঃ সেদিন লোকে যদি বলত তুমি ভাল লোক লও, ছাড়ত পুলিশে—এখন ত হাজতে পচতে।'

অটল এ যুক্তির কাছে হার মেনে নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু ডলি ছাড়ে না। সে ক্ষোভের সঙ্গে তার যন্ত্রণার কথা বলে, যা নতুন সংসার নির্মাণপর্বের স্বপ্ন আভাসিত, যা অটলের প্রতি ভালবাসারই প্রকাশ, যা একজন নারী কেবলমাত্র দয়িতের জন্যেই অনুভব করতে পারে। অটল বিব্রত হয়। সে কিছুতেই ধীরের মাকে দুটো খেতে দেওয়ার মধ্যে কোন অধর্ম খুঁজে পায় না। ডলি চেঁচিয়ে চলে যাওয়ার পর অসহায়ের মত বসে থাকে। তবে ধীরের মায়ের ভার বহন বেশিদিন করতে হয় না। একদিন মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে বুড়ী। গাঁয়ের লোক চাঁদা তুলে সৎকার করে।

শাঁখা এল চকায়। পুলিশি হামলার কথা সে শুনেছে। ভালমানুষকে কী না দুর্ভোগ পোহাতে হল। ডাকাতির পর জগা কোথায় কে জানে। অটল কি জানে খবর? শাঁখার জানার আগ্রহ আছে, পুলিশের হাতে তুলে নিশ্চিন্ত হবে। জেলবাস করে শাস্তি পেয়ে শিক্ষা তো হতেও পারে। মানুষটা যে ভাল হবে, হতে পারে সারা অঞ্চলে চেনা-জানার মধ্যে একমাত্র অটল নামের মানুষটি জানিয়েছে কেবল। তার সঙ্গে এখানেই মিল। তার দুর্ভোগের কথা শুনে শাঁখার অনেক আগেই তো ছুটে আসা উচিত ছিল! উঁহু, শোনে নি—শাঁখা শুনেছে গতকাল।

ভালবাসার মধ্যে সর্বনাশ থাকে। পিরীতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না। শাঁখা কবেই টের পেয়েছে। তারপর কেবলই দহন। তবু আশা আছে এখনও। সে কষ্ট করে খাবে। শাড়ি গয়নার মোহ তার নেই, সুখাদ্যেরও লোভ নেই—ভালবাসার মানুষ কেন যে বুঝল না। বারবার কেবল শাঁখার পরাজয়। প্রসাদকার মেয়ে বুড়ী তার ফুল, সেই খেলাঘরের কাল থেকে আজও তার ঘনিষ্ঠতা। তিন ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। বাপের বাড়ি এলেই তার কাছে বেশি সময় পড়ে থাকে। বলে, 'দেখালি বাবা, বিয়ে করবি কবে টে, ছেলেপিলে মানুষ করতে হবে নাই, পিরীতে মজার আগে ভাবতে হত।' বলে, 'ডাকাতের বৌ না হয় হলি—কী বটে। চোর-ডাকাতের বৌ থাকে না, আর তা যদি না করিস্ বেটাছেলের অভাব। আমার পিসতুতো দেওর রইছে, বলিস্ ত কথা বলি।' শাঁখা বোঝাতে পারে না। ছেলেবেলার বন্ধু, কত মনের কথা হয়, তাকেও সে বোঝাতে পারে না রহস্য। যেন জগার জন্যে বুকের মধ্যে একটা ঘর আছে, পাঁজরা ভেঙে সে ঘর বের করা মৃত্যুরই নামান্তর। এখন রাতে তার বারবার ঘুম ভেঙে যায়। এই বুঝি বাইরে থেকে ডাকে। অন্ধকার রাতে বৃষ্টি, ব্যাঙের ডাক, বর্ষা পোকাদের কলতান বুকের

উপর চেপে বসে কেবল তাকে কাঁপায়।

অটল ঘরে নেই। গরু নিয়ে পালে গিয়েছে। শাঁখা ঘরের খোঁজ করতে ভুতোর বেটা পরান ঘর দেখিয়ে দেয়। পরেশের মা বন্ধ ঘরের সামনে অপরিচিত মেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছ?'

'অটলদা। ওই যে গাংঠিপালের বাগাল।'

'তা দুপুরে কী ঘরে থাকে। গাংঠিপালে আছে। কে বট? ঘর কুথা?'

'শিবপুর।'

'শিবপুর। পরেশের মা যেন চেনার চেষ্টা চালায়।

ভুতোর বৌ মিতি এসে পড়ে। শাঁখাকে দেখে বলে, 'ওমা তুমি! তুমি আমাকে চেন না। আমি তো চিনি। তুমি ত শাঁখা বট।'

'হ্যাঁ।'

'আমি মিতি। বুঝেছি কাকে খুঁজছ! গাংঠিপালের অটল। ঘোষালদের আমবাগানের কাছে পাল রইছে। চল এই তো কাছেই। আমিও ভাত নিয়ে ওদিকেই যাব। পরানের বাবা মাঠে আছে। তাহালে দাঁড়াও একভুং।'

শাঁখা ভাবে, তাকে চিনল কী করে? জগা ছাড়া কে বলবে। ওমনি ভয় আসে মনে। জগার ছায়া যেখানে সেখানেই তো শঙ্কা। সম্পর্কের জন্যে তাকে ঘিরেও অবিশ্বাস ঘৃণার মেঘ জমে যায়। তবে এর কথায় ব্যবহারে তেমনটি তো নেই। অটলদার মত এও কী দরদী, জগার ভাল চায়, ভাল করতে চায়, মায়া আছে, ভালবাসা আছে।...

মিতি একটা সাদা কাপড় দিয়ে হাতের পাতায় ভাতের থালা বসিয়ে হেঁটে আসে। বলে, 'চল। শিবপুরের দিকে কম যাই, তাই তোমাকে দেখি নাই। শুনেছি তোমার কথা।' চাপা গলায় বলে, 'কিছু খপর আছে?'

'খবর। কার?'

চোখ ঘুরিয়ে মুখে হাসি নিয়ে স্বর অতলে মিতি বলে, 'আমার কাছে গুপন করতে হবে না। আমি তোমাদেরই লোক বটি, অধম্ম করতে পারব নাই। নিজের দেওর নাই—উ ত নিজের দেওরের পারাই বটে। কত বৌদি বৌদি। ডাকাত হলেও মন ভাল। পরানের বাপ কত দুষে আমাকে, সন্দ করে, দেওর ভাতারি বলে গাল দেয়, কিন্তু আমি জানি আমরা পাপে নাই। পাঁচজনাও কথা বলে—বলুক—আমি গেরাহ্যি করি না।' থেমে বলে, 'এসেছিল?'

শাঁখা মাথা নাড়া দেয়।

'পুলিশ খুঁজছে। গাঁয়ের মানুষও তক্কে তক্কে আছে। এলেই বেঁধে রাখবে।'

'রাখুক। পুলিশে ধরুক।'

'এ তোমার রাগের কথা। অমন করে বলতে নাই। বিচারি কুথা ঘুরে মরছে—কে জানে।'

'যেমন কাজ করবে, তেমনি ত ফলভোগ করতে হবে।' শাঁখা বলে, 'আর কত দূর যেতে হবে।'

'ওই তো গরু চরছে। ঘোষালদের আমবাগান ওই ট। কিছু বলবে উকে?' মিতির জিজ্ঞাসা করেই মনে পড়ে যায়, 'আহা ভালমানুষের কী হেনস্থা। হারামজাদা গুখেকোর বেটা ছোটবাবু বুকে চিপে পুকার মত মেরে দিছিল গো। ভাগ্যিস্ ডলি তখন রুখলেক।'

'ডলি কে?'

'ওমা! জান না। এ গাঁয়েরই। হারার বৌ। হারা ত মরে গেইছে। এখুন ডলি অটলে মজেছে।'

শাঁখা অবাক চোখে তাকায়। কোন সাড়া করে না।

'তবে সাঙা করা বটে। করবেক হয়ত।'

'একা মানুষ ভালই ত হবে।'

মিতি বলল, 'ওই দিকে যাও। আমি বাঁয়ের আল ধরব। আবার এসো।'

সামনে একটা পুকুর। শূন্য পাড়। পাড়ের নিচে ক্ষেতের সারি। একজন লাঙল টানছে। ওদিকে আমের বাগান বলতে চারটে আমের গাছ নিয়ে একটা পরোটা সাইজের ডাঙা। গরুর পাল সেখানে। শাঁখাকে যেতে হয় না। তার আগেই অটল কাছে আসে। হাতে লাঠি, খাটো লুঙির উপর উদোম বুক, মুখ ঘাম ভেজা, খোঁচা দাড়িগোঁফ। শাঁখাকে দেখে যেন আহ্লাদে একটা ঢেউ বয়ে যায়।

'এদিকে কোথা?'

'তোমার কাছেই।' শাঁখা হাসে।

'একদম সময় পাই নাই। শিবপুরবাগে যাওয়াও হয় নাই। ভাল আছ?'

'হ্যাঁ। কাল শুনলম্ পুলিশ তোমাকে ধরতে এসেছিল।'

অটল যেন সে কষ্টের কথা ভুলে গিয়েছে। বলে, 'আর বলো না সে এক কাণ্ড বটে। আমি ত ডরেই মরে যেছিলম।' হাসি আসে অটলের।

'তোমার হাসি আসছে! শোনা তক আমি রাগে মরছি। আসুক একবার।'

অটল মাথা দোলায়, 'রাগ চণ্ডাল। রাখতে নাই মাথাতে। শিবপুর গেলেই

তোমার ঘর যাব। কষ্ট করে এলে কেনে, খবর দিলেই যেতম।'

'তোমার রাগ হয় নাই?'

'জপার উপর। তবে হ্যাঁ, ডাকাতি ছাড়ল নাই, রাগ হবার কথা।'

'আছা জেল ঘুরে এলে ভাল মানুষ ত হতে পারে।'

অটল কী উত্তর দেবে! শাস্তি ভোগ করে কী মানুষ শুদ্ধ হয়, কুকর্ম করে না? বলে, 'হতে পারে। আগুনে পুড়ার জ্বালানি জানে বলে ত মানুষ আগুনে হাত দেয় না।'

সহসা শাঁখার মুখ উজ্জ্বল হয়। খোলা চুল এসে পড়েছে মুখে, মস্ত টিপ কপালে, মুখে ঘামের বিন্দুরা, দু'চোখে ভাবনার ঘনত্ব যেন স্রোতধারা হয়ে পড়েছে। কলকল বহমানতার মত বলে, 'তোমার কাছে এলে ধরিয়ে দিবে—আমিও ধরাব।'

'আসুক। কোথা যে ঘুরে মরছে।'

'আমি যেছি। তুমি তাহলে যেও।'

'চল তোমাকে দাঁড়িন দি খানিকট।' অটল ঘাড় ঘোরায়, 'ভোলা আমি একটুস্ আসছি।'

ভোলা দূর থেকেই বলে, 'ঠিক আছে।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শাঁখা বলল, 'নিজে মরছে, আমাদিকে মারছে।'

'কী করবে বুনোটি। যেমুন ভাগ্য করে এসেছ!'

সরু রাস্তা। একদিকে ডোবা, বাঁশঝাড়, তালের গাছ, গোপালপুরের নিচু পাড়ার শুরু তারপরই। জোড়া খেজুর নিয়ে পোড়া ডাঙা। পার হলেই মাটির সড়ক শিবপুরের। রোদ এখন বুক ভর্তি, আগুন নিয়ে ফুৎকার ছুঁড়ছে। সবুজ সজীবতার চতুর্দিকে ব্যাপ্তি, জলচিহ্ন অকস্মাৎ কাদামাটি জমি, তবু রৌদ্র শাসনের পোড়ান জ্বালার থামতি নেই।

শাঁখা বলল, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমি চলে যাব।'

পাশে অটল দাঁড়িয়ে থাকল। শাঁখার কাছে সে যাবে। কিছু বলার নেই, কিন্তু পাশে দাঁড়াতে ত পারবে।



ডলির ছেলেটার দু দিন জ্বর। ছেলেকে ঘরে রেখে ধানপুঁতানির কাজ করতে হচ্ছে। মন্দাপিসি ছেলে দেখে। ভাত দিতে হয় বুড়ীকে। লোকে এখন কানি বলে মন্দাকে। দিনমানেও সবই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে দেখে বুড়ী। বয়স হয়েছে, সঙ্গে অভাবের রক্তশোষক নলের খিঁচুনিতে খাটো টেনায় আধঢাকা কাঠি শরীরের শক্তি নিঃশেষিত, শ্লথ মাংসপেশী, হাড়ের কাঠামোটা মাটি মুখী ন্যুব্জ, মাথায় শণের মত পাকা চুল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মাকে নিয়ে গিয়েছিল। থাকতে পারেনি। একা ঘরে থাকে অর্ধাহারে অনাহারে। ভিক্ষে করতে বের হয় এ গাঁ সে গাঁ। এখন ডলির ছেলের দায়িত্ব নিয়েছে। দু'বেলা অন্ন দিতে হবে। ডলি যেন বেঁচে গিয়েছে। এই শেষ আষাঢ় শাওনের ক'টা দিন ধান পুতুনির কাজ। ছেড়ে দেওয়া যায় না। পনের দিন পুঁতুনির কাজ করতে পারলে তিন চারশ টাকা। ছেলেকে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার দেখিয়েছে, ওষুধও এনেছে, জ্বর যদি না ছাড়ে! সদর হাসপাতালে কী কোন প্রাইভেট ডাক্তার দেখালেও তো টাকা লাগবে! ক্ষেতের কাদাজলে ছপছপানি কাজের মধ্যে ডলির একটাই ভাবনা, এই বুঝি কেউ দুঃসংবাদ নিয়ে এল। পুঁতুনির কাজ শেষ হলেই সে অন্য ডাক্তার দেখাবে।

মেঘহীন আকাশের তকতকে বিকেল, যেন ঝাঁট দেওয়া নীল উঠোন। রোদের পশ্চিমঢলা দীপ্তিতেও তাপের নির্ঝর। ডলি একটু আগে গা ধুয়ে ফিরেছে। এবার রান্নার আয়োজন করতে হবে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বসতে হয়েছে। পিসির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। ছেলের জন্যে বিস্কুট মুড়ি রেখে গিয়েছিল—ছেলে খায়নি। ধুমজ্বর। 'খেয়েছিলিস বেটা' বলতে চিঁ চিঁ করে 'না' বলল। পিসি খেয়েছে। স্বীকার করে না, উল্টে রাগ, 'থাকুক তুর ছেলে, দেখতে পারব নাই, ভিন্ন ব্যওস্থা কর', বলে বেরিয়ে গেল। তবে ভাতের জন্যে এখুনি ফিরে আসবে। শুধু তো পিসি নয় দুপুরে পান্তা খেয়েছে, তারও তো ক্ষুধা আছে। ডলি সিদ্ধান্ত নেয় কাল সে বেরুবে না। তবে রোজই এই সিদ্ধান্ত, সকাল হলেই বেরিয়ে পড়া।

ছেলেকে ছেড়ে ডলি উনুনে ধরায়। একা হলে মুড়ি খেত। ভাবে, না, কাল সে কিছুতেই কাজে যাবে না। ছেলে দেখবে। অটল এসে ঘরের সামনে দাঁড়াতে অভিমান তার দেহমনকে আবৃত করে দেয়, কান্না পায়। উনুনে শুকনো খেজুর পালি গুঁজে গুঁজেতে একবার দেখে ঘাড়ও ফেরায় না।

অটল কাঁথা লেপটে থাকা ছেলেটাকে দেখে। বলে, 'ই কী দশা হয়েছে!'

ডলির বুকে অভিমানরুদ্ধ ঢেউ ধাক্কা দিয়ে চোখে অশ্রু এনে দেয়।

'আমাকে ত বলে পাঠালে পারতে!'

কোনক্রমে ডলি বলে, 'কী আবার বলব!'

'হাসপাতাল রাখ, কালকে ঘোষাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

'টাকা কোথা?'

'ধার করতে হবে। দুধের শিশুকে মরতে দেওরা যায় না। আমার কাছে চাল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকা আছে।' একটু থামে অটল। বলে, 'ছেলে ফেলে তোমার ধান পুঁতুনিতে যাওয়া ঠিক হছে নাই। আগে ছেলে দেখ—তা বাদে কাজ।'

ডলি এবার শব্দ করে কেঁদে ফেলে। দু' হাঁটুর মাঝে মুখ রেখে ফোঁপায়।

'এই দেখ, কাঁদে! আহা আমি ত রইছি। ছেলে ভাল হয়ে যাবে।'

ডলি নিজেকে সামলে নেয় অল্পক্ষণেই। বলে, 'চা খাবে। বস—করছি।' ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চায়ের বাটি বসায়। ঘরে ঢুকে লম্ফটা জেবলে আনে।

বাইরে রৌদ্রহীন বিকেল। পশ্চিম আলোকের ছিটেফোঁটায় ম্লানাভা অপরিচ্ছন্নতা ফেলছে শুধু।

অটল ছেলেটার পাশে যায়। বিছানায় মেশা শিশুটি চোখ তোলে। শব্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। পাঁজরা বুক ওঠানামা করছে। এ কী বাঁচবে! ভাবনায় অটলের মন মমতাময় হয়, সে কপালে হাত রাখে। পুড়ছে কপাল। বলে, 'বিস্কুট খাবি। ছেলে সাড়া দেয় না। নিষ্পলক চাউনি শুধু বারিবিন্দু গড়িয়ে দেয়। অটল জিজ্ঞাসা করে ডলিকে, 'বিস্কুট ঘরে রইছে?'

'হ্যাঁ'। ডলি এগিয়ে দেয় টিনের একটা কোটো।

অটল খুলে বিস্কুট ভেঙে দেয় ছেলের মুখে। ছেলে খাবার চেষ্টা করে। বিকৃত করে মুখ, খেতে পারে না।

'জল খাবি। দাঁড়া।' অটলই ব্যস্ততার সঙ্গে গ্লাসে জল নিয়ে সযত্নে ঢেলে দেয়

মুখে, ডলির উদ্দেশে বলে, 'জ্বরজ্বালাতে মা কাছে থাকলে আধা রোগ সারে। ছেলে কাহিল হয়ে গেইছে। কাল থেকে বন্ধ কর কাজ।'

মন্দাবুড়ী রেগে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। ভাত খেতে হবে না। সকালে ত পান্তা ছিল। গরম ভাতের স্বাদই আলাদা। পেটের নাড়িভুঁড়ি টান মারছে। কী যে খিদে, মরতে চায় না। ডলি ঘরে থাকলে তার ছুটি, দু' বেলার অন্ন বন্ধ, সে যাবে কোথা! অটলের কথায় কোঁচকান মুখে বিরক্তি রেখা গড়ে বুড়ী। খোলা ঠোঁট নাড়া দেয়। ভাঙা দাঁতের জন্যে শব্দেরা কেমন যেন জড়ান, 'কাজ বন্ধ করলে চলবে কী করে! অল্প জ্বরজ্বালা ছেলেপিলের হয়। আমি ত দেখছি।'

ডলি বলল, 'তোমাকে আর দেখতে হবে নাই।'

অসহায় আর্তি বেরিয়ে আসে বুড়ীর গলায়, 'তাহলে আমার কী হবে? আমাকে ত ভাত দিবি নাই বৌ। আমি কী খাব?'

ডলি সাড়া করে না। অটল পাথরের মত বসে থাকে।

বুড়ী ঝিম্ মেরে থাকে অল্পক্ষণ। সন্ধ্যার আঁধার ঢাকা হয়। বলে, 'এখুন ত দিবি। আজ ত আগুলেছি তুর বিটাকে।'

পরের দিনই ঘোষালডাক্তারের কাছে ছেলে কোলে ডলির সঙ্গী হয় অটল। হাঁটাপথ, কোন যান নেই। দূরত্ব মাইল তিনেক। শিবপুর ঘুরে রিক্সায় অবশ্য যাওয়া যেত। হাঁটাপথ কোথাও খানিকটা প্রশস্ত, কোথাও ক্ষেতের আল। মাঝে খাল, ডাঙা, বাঁশবন, সাঁওতালপাড়া। আলপথ কাদা ছপছপে। বৃষ্টি নেই এই যা রেহাই। রোদ চকমকানি নিয়ে পড়েছে। কোলের ছেলেটা মাথা তুলতে পারছে না, মায়ের কাঁধে রেখে নির্জীবের মত পড়ে আছে। রোদ বাঁচাতে ছাতা নিয়েছে ডলি।

হাঁটতে হাঁটতে ডলি বলে, 'শাঁখাও তো এসেছিল তোমার কাছে।'

'শাঁখা বড় ভাল মেয়ে। জগা ওর কাছে এলে ধরিন্ দিবে।'

'ও মুখের কথা, পারবে না। ভালবাসার মানুষকে কেউ কষ্ট দিতে পারে না। দোষ থাকলেও না।' একটু থেমে ডলি বলে, 'বলে রাখছি, আবার তুমি ফ্যাসাদে পড়বে। খারাপ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সবাই খারাপ ভাববে।'

ঘোষালডাক্তারের বয়স হয়েছে। ছেলেরা বড় চাকুরে, মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছিলেন রেলের ডাক্তার। অবসর নিয়ে এখন গাঁয়ে বসেছেন। ভিজিট নেন না। ওষুধের দাম দিতে হয়। ডিসপেনসারী চালায় জগদীশ। সকাল সন্ধে দু' বেলাই ভিড় লেগে থাকে। আশপাশের গাঁ তো ডাক্তারশূন্য। শিবপুরে হরেন

চাটুজ্জে রয়েছে, বস্ত থাক। চারজনের পর পাঁচ নম্বরে তাদের ডাক পড়ে। ছেলেটাকে দেখে খসখসিয়ে ওষুধ লিখে দেন। বলেন, 'ভরসা দিতে পারছি না। ইচ্ছে হলে বড় ডাক্তার দেখাতে পার। জগদীশের কাছে ওষুধ ওষুধ পাবে।';

ডলির গলায় আটকানো কান্না উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা জাগে, 'ডাক্তারবাবু ভাল হবেক ত আমার বেটা।'

'বলছি তো অবস্থা ভাল নয়। আগে আসতে পার নাই মা। দেখ যদি বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পার। আমার ভরসাতে থেকো না। হ্যাঁ, তারপর তোর কী হয়েছে?' ঘোষালডাক্তার অন্য রোগীর দিকে চোখ ফেরান।

ওষুধ কিনতে ত্রিশ টাকা লাগে। ফেরার পথে ডলি বলে, 'হ্যাঁ গ, বাঁচবে ত।'

'কেনে বাঁচবে না।'

'সিউড়ীতে বড় ডাক্তার আছে। চাটুজ্জে ঠাকরুণ বলছিল বর্ধমানেও বড় বড় ডাক্তার। উখানেই ত দেখছে ঠাকরুণকে।' কেঁদে ফেলে ডলি, 'টাকা কোথা! অনেক টাকা লাগে।'

'তার একটু ব্যবস্থা হবেক।'

'অত টাকা দিবেক কে! হাজার, দু হাজার।'

অটলের সাধ্যাতীত। তার চুপ করেই থাকার কথা। ডলির পুত্র হারানের আশঙ্কা, উদ্বেগ, ভয়ত্রাসের কান্নাকে প্রশমিত করতে বলতেই হয়, 'দেখি ধারধোর করে টাকা ব্যবস্থা করতে হবে।'

গাঁ ঢোকার মুখে দাসেদের চতুষ্কোণ পুকুরটার পাশের জমি থেকে বাবলা হাঁকে, 'দাঁড়াও অটলদা।' কাছে এসে বলে, 'কোথা গেইছিলে!'

'এই যে ঘোষালডাক্তারের কাছে।'

বাবলা ছেলেটাকে দেখে। ডলিকে বলে, 'কী হয়েছে?'

'ভুগছে খুব। ডাক্তার তো দেখলেক।'

বাবলা তেমন গুরুত্ব দেয় না ডাক্তার দেখানোয়। বলে, 'পঞ্চায়েত অফিস দিকে ত যাও নাই। তোমার ডি আর ডি এ সব হয়ে গেইছে। গাই লিবে ত এক জোড়া! বিপ্টেকে বলতে বলেছিলম—বলে নাই?'

অটল বলল, 'না।'

'চাবের সময়। কে কাকে খবর দেয়। আজি পঞ্চায়েতে চলে যাও—সেখান থাকবে। তের হাজার টাকা পাবে। কেটে রেখে দিবে তুমার নামে পাঁচ ছ' হাজার।

ঋণ শোধ না দিলে ও টাকা পাবে না। গাই কিনেও দু' এক হাজার পেয়ে যাবে।'

'ঋণ কেনে করব ?'

'তাহালে অনুদান পাবে কী করে।'

'আমি ঋণ লুব না।'

'যা বাব্বাঃ সরকার কী দানছত্র খুলেছে। তবু পুরোটাই লাভ।' বাবলা সমঝে দিয়ে স্বর নামায়, 'কোন শালা শোধ দিছে। তোমাকেও দিতে হবে না! লোক দেখানি, গাই দেখিয়ে দিলেই হবে। সে পাইকারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেই হল। শ' দুই টাকা ধরে দিলে হয়ে যাবে।'

অটল বলল, 'সব বুঝছি। আমাকে দেনাদার হয়ে ত থাকতে হবে।'

'কে দেনাদার লয় বল দেখি।'

'আমি জানি। ঢেক লুক নিয়েছে, শুধছে না। তেবে আমার দ্বারা উ অধম্ম কাজ হবে না। আমি লুন লুব না।'

বাবলা অবাক মানে, 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ!'

'দিব্যি আছি। তুমি বলে দিও পোধানকে।'

'তুমি নিজে বলবে। লুকে পায় না আর তোমার পেয়ে ফেলিন দিয়া, পরে আফশুষ করে মরবে।' বাবলা একটা শব্দ করে ওদিকের মাঠে নেমে যায়।

দু' পা হেঁটে ডলি নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'তাহালে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি টাকা পেলে শোধ দেবে বললে হাজার টাকা ধার পেয়ে যাবে।'

'আমি ত ডি আর ডি লুব না।'

ডলি যেন ধমকায়, 'লিবে না মানে। ছেলেটর চিকিচ্ছে করাবে না!'

'করাব। বকনট বিচে দুব।'

'সে আর কত টাকা ?'

'ধার করব। শোধ করব তারপর খেটেখুটে দু'জনাতে।'

ডলি মাথা নাড়া দেয়, 'কিন্তু অত টাকা ধার খেটে শোধ করব বললে কেউ দেবে ভেবেছ ? কেউ দেবে না।'

'চেষ্টা করতে হবে।'

'চেষ্টা করবে। হাতের ধন লিবে না—বল ছেলেট মরুক, তাই তুমি চাও।'

'ছিঃ ছিঃ কী যে বল, তার ঠিক নাই।'

'ভি আর ভি'র টাকা তুমি নিবে না ?'

'না।' বলেই অটল ব্যস্ততার সঙ্গে আশ্বস্ত করতে চায়, আমি আজই টাকার ব্যবস্থা করছি। ছেলেটকে কাল সিউড়ী নিন্ যাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'তাহালে টাকার লেগে পঞ্চায়েতে যাবে না ?'

'না।'

'ঠক আছে।' ডলি দাঁড়ায় না।

অটল আটকাতে চায় ব্যগ্রতা নিয়ে, 'আহা শুন, শুন।' ডলি দ্রুত দূরত্ব গড়ে। ঘাড় পর্যন্ত ফেরায় না।

অটল ভেবেছিল, সারাটা দিন পড়ে রয়েছে, টাকার ব্যবস্থা সে করে ফেলবে। ভোলার কাছে গরুর পাল রেখে বামুন ঠাকরুণের কাছে, বকনাটাকে বিক্রি করব বলে পিনাক রায়ের কাছে, নুটু গেরস্তর কাছে, ঘোষেদের বড়বৌয়ের কাছে মিলিয়েজুলিয়ে পাঁচশ টাকার মত জোগাড়ের অবস্থায় আনে। না, টাকা হাতে পায় না। কাল পাবে। তাকে ধার দিবার আরও লোক রয়েছে গোপালপুরে। সুদবন্ধকীর কারবার করে শম্ভু, তার কাছে যায়নি। তাছাড়া যাদের গরু চরায় ওই সেনেরা শনিবার গেরস্ত কাজের জায়গা থেকে সপ্তাহান্তিক ছুটিতে এলে এক দু'শো পাবেই। কথাটা ডলিকে বলে আসবে কী। ভোলা এল। দিনে ভাত খায়নি, রাতে না খেলে চলবে কী করে। মা ডেকেছে। ও ঘরে খেয়ে আসতে আসতে সন্ধে গড়িয়ে রাত। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হল। ছাতা নিয়ে ভোলা ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ভোররাতে ডলির কান্নার শব্দ চকার মানুষকে সচকিত করে দেয়। এঘর ও-ঘর থেকে ছুটে যায় সকলে। ছেলে কোলে, মাথায় চুল এলো ডলি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ছে। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির অনুজ্জ্বল সকাল। একটি শিশুর মৃত্যু চকার মানুষকে শাওনের এই সকাল যেন কিছু সময় কান্না, আফশোষ, শোক যাতনায় উদ্বেলিত করে সান্ত্বনার কিছু শব্দ ছোঁড়ার মধ্যে অন্য রকম করে রাখে। এসেছিল একটি শিশু, পৃথিবী তাকে বাস করতে দিল না। কোথায় যেন যন্ত্রণা তাই থেকে যায়। এক মায়ের কান্নার শব্দও এক সময় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। যা যায় তার চেয়ে যা থাকে তার মায়াই মানুষের কাছে ঢের বড়।

অটল ডলির কাছে যাওয়ার সুযোগই পায় না। পড়শী নারীকুল ঘিরে থাকে। সকলেরই শত্রু মৃত্যু, তার কোন গৃহে আগমনে সেই গৃহের প্রতি মিত্রতাবোধ জেগে ওঠে মানুষের। ডলির আজকে খাওয়ার ভাবনা নেই, সঙ্গীও যে পেয়ে যাবে। অটল ভাবে, ডলি তো জানে সে মিথ্যা কথা বলে না। বিশ্বাস করবে বৈকী কাল সারাদিন

টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় সে কাটিয়েছে, ব্যবস্থাও হয়েছিল. মৃত্যু যদি ছিনিয়ে নেয়। হ্যাঁ, বিশ্বাস করবে। কিন্তু ভাবনাই সার। ডলির মনের কথা জানা তার হয় না। পরদিন ডলি ওর দিদির বাড়ি দুবরাজপুরে চলে যায়। ঘরে তালা ঝোলে। তাকে বলে পর্যন্ত যায় না।

শ্যামদাস বৈরাগী লম্বা গড়নের কালো চল্লিশ পেরুন পুরুষ। মেয়েলী চুল ঘাড় ছাপিয়ে. মুখে তিলক চন্দন ফোঁটা, ধুতিকে লুঙ্গির মত পরা, গায়ে ফতুয়া, কাঁধে ঝোলা পেটমোটা গৈরিক থলে লম্বা দড়িতে কাঁধের দুদিকে ঝোলে খঞ্জনি। মুখে খোঁচা দাড়ি গোঁফ থাকলেও কেমন যেন নমনীয়তা, শান্ততার ছাপ, ভাবুক চোখ, থেমে থেমে শব্দ উচ্চারণ করে। সর্বদাই বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচেন ভঙ্গীমা, মুখে কথায় কথায় গভীর তত্ত্ব রূপক উপমা ব্যঞ্জনায় আলটপকা বেরিয়ে আসে। নিজের কথাতে নিজেই বিভোর মানুষটি, আহা আহা এবং রাধে রাধে ধ্বনিতে পুলক শিহরিত হয়।

শ্যামদাসের বৈষ্ণবী তাকে ছেড়ে গিয়েছে মাস ছয়েক আগে। মানুষটা তারপর কিছুদিন ঘরে থেকে বেপাত্তা, হঠাৎই আজ এল। নগরে ঘর। নামেই ঘর। ঘরে থাকে ক' দিন। দেশ জোড়া নাকি তার ঘর। আকাশ তাঁবু থাকতে অমন ছুটকো চার দেওয়ালের মায়ায় পড়ে থাকবে কেন। শ্যামদাস বলে। ভিখিরি বৈষ্ণবের সঙ্গে সংসারী অটলের ভাবভালবাসা আচমকা। বিকেলে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তার ঘরে ঢুকেছিল। তা বৃষ্টি থামে না। রাত কাটাতে হয় শ্যামদাসকে। এক রাতেই যেন কতকালের সখ্য গড়ে ওঠে। তত্ত্ব কথার শোনার গভীর আগ্রহও আছে। অর্থ সব বোধগম্য হয় না, কিন্তু যেটুকু বোঝে তাতে তার ধর্ম হয়, সে অনুভব করে। অন্যায়ের বিচার করতে, অধর্মের কালিমা মুছতে, সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল পাপতপ্ত ধরণীকে শীতল করতে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে। যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়। রাধার সঙ্গে লীলাও বড় মধুর। শুনে বুক ভরে যায়।

অটল সকাল থেকে গাই দুইয়ে, বিশুর মায়ের কয়লা বয়ে দিয়ে, গরু খুলে আধা দুপুর কাটিয়ে, দায়িত্ব ভোলাদের কিছুক্ষণের জন্যে দিয়ে, দোকান থেকে চাল আলু নিয়ে ভাত সবে মাত্র নামিয়েছে। ফেন গলাচ্ছে থালায়। বেলা বেড়েছে। চড়া রোদের দারুণ পোড়ানি। ক' দিনের বৃষ্টিহীনতায় বর্ষাচিহ্ন উধাও। ভাত খেয়েই আবার গরু দেখতে যাবে, এমন অবেলায় শ্যামদাস।

শ্যামদাসকে দেখে খুশী হয় অটল, "ছিলে কোথা এতদিন?"

'আর কোথা ! কোন ঠিকানা বলব. কাটোয়া, নবদ্বীপ, বর্ধমান—এখান সেখান তা বাদ বাঁকড়ো। পায়ের তলায় চাকা, গড়গড়িয়ে যায়. ডেরাইভার আমি নই গো, ঠিক কী না। রাধাকৃষ্ণ. কে ডেরাইভার নিজেই বল। তা ভাত নামল। বড় সুঘ্রান তোমার ভাতের।'

অটলের ক্ষুধা পেয়েছে, কথার কথা বলে. 'সেবা হবে নাকি ?'

'নলছ ! কিন্তু তোমার অগ্রে ভাগ পাড়ব।' শ্যামাদাসের মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই গা ঝাড়ানি দিয়ে বলে, 'রাধেকৃষ্ণ, তা দাও। বড়ই ক্ষুধা। পেটের বাঘ অনেকক্ষণ থেকে হালুম হুলুম করছে। ভাতের গন্ধে গরগরানি এখন আবার। চিঁড়ে মুড়িতে চারদিন পার করেছি। রাধে কৃষ্ণ ! পেটে পুষেছি বাঘ, কতদিন ভাবি পাখি পুষব, দুটো দানা পেলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু বাঘ যে খাঁচা ছাড়ে না বাবাজী।'

অটল নিঃশব্দে ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ আলু আর কচু তেল নুন দিয়ে মেখে দুটো কাঁচালঙ্কা থালার পাশে দিয়ে ভাত সাজিয়ে দেয়। হাত ধুয়ে কৃষ্ণে নিবেদন করে শ্যামদাস খেতে বসে। তার চোখেমুখে যেন রাজকীয় খাদ্য সম্ভারের আয়োজন এমন সুখ। গ্রাস তোলা, মুখ নাড়ার মধ্যে অমৃত আস্বাদনের ভঙ্গী। থালা মুহূর্তে শেষ। বলে, ভাত আছে ?

'হ্যাঁ।' অটল তো কালকে পান্তা রাখবে বলে বেশি চাল নিয়েছে।

'ঢেলে দাও। রাধে কৃষ্ণ। দাও—সবটাই দাও।' হাঁড়ি উজাড় করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। হাত ধুয়ে বলে, 'এই দেখ, তোমার ভাত রইল না। খাবে কী।'

অটল বলে. 'মুড়ি।'

'বলছিলাম না বাঘ পুষেছি পেটে। সে কী মনে রাখতে দেয় কিছু। এই দেখ খেয়ে ঘুমোল। এখন মনের পাখি কিচিরমিচির করছে। এর জ্বালাতনও কম নয়। বলছে, অটলের কী হবে। ওর ভাত যে তুমি খেলে ও খাবে কী। লাও ঠালা। রাধে কৃষ্ণ। তা পাক আমিই করি।' কাঁধের ঝোলা থেকে চাল, আলু, একফালি কুমড়ো বের করে। 'লাও, হাঁড়ি চাপাই। জল রইছে বালতিতে !' নিজেই কাঠ দেখে নিয়ে উনুনে দেয়।

অটল বিব্রত বোধ করে, 'আহা, তোমার জিনিস রাখ।'

'ভিক্ষের চাল খেতে লাজ।'

'তা কেনে !'

'না খেলে আমার মনের পাখির কচকচানি বন্ধ হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাক। চাপাব আর নামাব। সেবা করতে দাও।'

'পাশে গর্ আছে। আমার দেরী হয়ে যাবে।'

'তোমার ভোলা পদাই গোপাল বিষ্টু ওরা তো আছে—দেখবে।' শ্যামদাস রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফুঁ দিয়ে উনুন ধরায়। চালে জলে আলু ফেলে দেয়। বলে, 'তোমার খবর বল।'

অটল সবিস্তারে জগার কথা, পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেয়।

'ডাকাত জগা তোমার স্যাঙাত হয়েছে জেনে পুলিশ এসেছিল? কিন্তু সাধুর স্যাঙাত চোর হয় কী করে? বাঘে হরিণে মুখ ছোঁয়াছুঁয়ি করতে পারে না, আলোর কাছে কী আঁধার তিষ্ঠোয়? পুব পশ্চিম তো একদিকে হাঁটে না।' শ্যামদাস উনুনে কাঠ গোঁজে। আগুন বাড়ায়। বলে, তাহালে আধমরাকে বাঁচিয়েছ তাই।'

'ভেবেছিলাম ভাল মানুষ হবে। বাজিও রেখেছিলাম তোমাদের সঙ্গে।' ওর ডাকাতি করা ছাড়াব।'

'পারলে না তো।'

'না।'

'জগা তোমাকে ডাকাত করতে চাই নাই? টাকার লুভ সুখের লুভ দেখায় নাই?'

অটল ঘাড় কাৎ করে, 'হ্যাঁ। দেখিস্ ছিল।'

'টানাটানি চলছে। তুমি উকে টানতে পার নাই—উ তুমাকে না! লাও ভাত হয়ে এল। ভাত রেঁধে খেতে পেলে না—রাগ হয়েছে—কষ্ট লাগছে?'

'তা লাগবে কেনে! আমিই তো দিলম তোমাকে।' অটল হাসে প্রশ্ন শুনে।

শ্যামদাস বাঁকা ঘাড়ে প্রশ্ন করে, 'ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমার চাল চাপান ঠিক হল নাই। ধরে চাল ছিল।'

'থাকুক। আমাকে ভিখিরি বলে দানের ধম্ম করতে দিবে না। তুমি অতিথ ধম্ম করেছ। আমি বরিগা মানুষ, ঝুলা আর খঞ্জনি সম্বল। ঝুলার ধন দিয়েছি। রাধে কৃষ্ণ। তোমাকে শুধলাম রাগ হয়েছে কী না। আহা, তোমার ভিতর ধম্ম-নদী। শীতল জল রাগকে চান করিয়ে হি হি কাঁপুনি ধরিন্ দিয়েছে। আমি কত বুকা দেখ—বুঝি নাই।'

'ধম্মনদী আবার কী?'

'বলব। খেতে খেতে শুনবে।'

'তা না হয় শুনব। উনুন ছাড়। খেয়ে জিরেন লিবে কোথা—রাঁধছ।'

'উহ্ঁ, ছাড়ব না। আমাকে খাইয়ে দিব্যি আনন্দ লুটে নিলে। বোকা ভেবো না, আনন্দ আমিও কুড়িয়ে নিতে জানি। রেঁধে বেড়ে তোমাকে খাওয়াব। মন পাখি তখন বুকের মধ্যে শিস্ দিয়ে গান গাইবে বাবাজী।'

অটল খেতে বসে। থালা সাজায় শ্যামদাস। তারপর হাত ধুয়ে বিড়ি ধরিয়ে গুছিয়ে কথা শুরু করে, 'কী যেন বলছিল ! ধম্মনদী। তাহলে শুন। দেখতে মানুষ সব একই। ভিন্ন ভিন্ন রঙ রূপ বটে, কিন্তু একট মাথা, দু'টি চোখ, দুটি কান, একটি নাক, দু'টি হাত, দুটি পা সবারই। রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জার কাঠামো, তাতে পঞ্চভূত, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। মানুষ যেমন ভেন্ন ভেন্ন রূপের তেমনি ভেতরেও মনের নানান রূপ। কেনে হয় সে এক রহস্য বটে। মনের মধ্যে নদীর খেলা। কল কল ছল ছল। এদিকে বইছে, ওদিকে বইছে।'

অটল মুখে পোরা ভাতের গ্রাস শেষ করে বলল, 'তার নামই ধম্মনদী !' ধর্ম নদী অধর্ম নদী। পাপের নদী, পুণ্যের নদী। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, অধম্মের নদীতে আথালিপাতালি করে বেড়ায়। খালি জ্বালা তাতে। সোয়াস্তি নাই, আনন্দ নাই। আর পুণ্যের নদী, ধর্মের নদীতে সুখ আর সুখ। কলকলানি ছলছলানিতে নূপুর বাজে। শ্রীরাধিকের নূপুর।

'তাহলে আমার মধ্যেও নদী আছে ?'

'হুঁ। সব্বার মধ্যেই নদী। তোমার অধর্মের নদী খটখটে। ধর্মের নদীতে জল কেবল বয়।'

'আমি ত ঠাওর করতে পারি না !'

'কান পাতলেই পারবে।'

অটলের ভাতের গ্রাস মুখে ওঠে না, 'নিজের বুকে কী কান পাতা যায় ?'

'হায় হায়, ও কান কী বাইরের, ও যে ভিতরের গো। রাধেকৃষ্ণ।' শ্যামদাস বলে, 'নাও খেয়ে নাও।'

অটল অনেক কথাই বোঝে না। তবে ধর্মের নদীর শব্দ শোনার কামনা জাগে ! মনে হয় বৈরাগী কত রহস্য জানে। ডলির মনকেও নিশ্চয় বুঝতে পারবে। তার সঙ্গে দেখা করল না, চলে গেল। ফিরে কী আসবে না ? ডলি চলে যাওয়ায় কী ভীষণ শূন্যতা সে যে টের পাচ্ছে, কত কষ্ট যে হচ্ছে তার।

'তোমার সঙ্গে একট কথা আছে।'

'বলে ফেল।'

'গরুর পাল থেকে আসি, তাবাদে বলব।'

শ্যামদাস বলল, 'খেজুরে পাটির তালাইটা দাও। পা গাড়িয়ে নেব। ঘরে কুলুপ এঁটে, চাবি নিয়ে যাবে। আমার থাকা না থাকা সমান।'

'সে কী, চলে যাবে ?'

'যাব না ত ভাবছি। তবে ডেরাইভারের যা মরজি—শুনবে কী কথা।'

অটল বলল, 'না। তুমি যেও না। বলছি না কথা আছে।'

শ্যামাদাস তালাই বিছিয়ে 'জয় রাধে' বলে শুয়ে পড়ে।

হনহনিয়ে হাঁটে অটল। মাথায় আবার ধর্মনদী আসে। তার মধ্যে আছে, জল রইছে। নিজের নদীটির শব্দ কেমন! শ্যামদাসের রাঁধা ভাত বড় সুস্বাদু ঠেকেছে, তৃপ্তিতে ভরেছে শরীর—কেমন যেন নেশাচ্ছন্নতা আসছে এই অবেলায়। তখনই সে ভেতরের ঢেউ অনুভব করে। হাঁটা থামায় না, হিল্লোলিত সুখ কাশফুলের গুচ্ছের মত দোলা খায় সমানে, বাতাসে সে যেন ভাসে। তারপরই কী আশ্চর্য চোখের সামনে সে দেখতে পায় এক নদীকে। সুতীব্র আলোচ্ছটার নদীর ঢেউয়ে রুপোলী মুকুট লক্ষ কোটি হয়ে নেচে চলেছে। নদীর পাড়ে সবুজ শ্যামলিমা, পরিপূর্ণতার ফসল ক্ষেতের পর ক্ষেতে। দেখা যেন ফুরোয় না। আশ্চর্য নদী আশ্চর্য হরিৎ সমারোহ এ পৃথিবীরই, আবার যেন এ পৃথিবীর নয়। দর্শন শিহরণ জাগা তারই সুখ হিল্লোলিত সমগ্র ইন্দ্রিয়কুল আনন্দময় হয়ে ওঠে। আনন্দ—আনন্দ। অটল পৃথিবী থেকেই বুঝি উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

'আরে এত ডাকছি, শুনতে পেছ না।' বাবলার উদোম গা, লুঙ্গি হাঁটু বরাবর তোলা, পা কাদাটে, ঘেমো রোদপোড়া মুখ, মাথার চুল এলোমেলো। বর্ষার বেয়াড়া ক্ষুদে মাছির দঙ্গল উড়ছে মুখের সামনে। বলে, 'শুনলম জগা এসেছে। দেখা গেইছে উকে।'

'তাই নাকি ? তুমি দেখেছ ?'

'দেখলে আর শুধোই। শালোকে ধরে হাজতে ভরতাম।' বাবলার মুখ কুঁচকে যায়। মুখের সামনে পাকমারা মাছিরা বিব্রত করছে, হাতের ঝাপটায় সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বলে, 'তোমার ত স্যাঙাত। আসবে তোমার কাছে।'

অটল বোকার মত আবার বলে, 'তাই নাকি! আসবে ?'

বাবলা বিরক্ত হয়। ডি আর ডি এ'র লোন নেয়নি, কাগজপত্র সব ঠিকঠাক, প্রধান নিজে বুঝিয়েও পারল না, রাগ হয়ে গিয়েছে। বাবলাও সেই রাগের খানিকটা ঝাঁজ নিজের মধ্যে নিয়েছে। সে অবশ্য নির্বোধ ভাবে অটলকে। এ বয়সেও গরুবাগালি করে। বলে, 'মাথাতে ত কিছু নাই। তোমাকে বাবা বোঝা কঠিন। বয়স হলে কী

হবে, বাপ্পাল ছোঁড়া হয়ে আছ। মনে রাখবে, ধরিন্ না দিলে তোমাকেও কাটকে পারবে। কুনু শালা বাঁচাবে না।'

অটল ভয় পায়, 'এলেই ধরিন্ দ্ব।'

'হ্যাঁ। মায়া করে ছেড়ে দিও না। তোমার ত ভিন্ চরিত্তির।'

পাবলাকে ছাড়িয়ে গরুর পালের দিকে যেতে যেতে অটল ভাবে, তাহলে জগা এসেছে এদিকে! কতদিন লুকিয়ে থাকবে। তবে ভাবনাটা মাথায় বেশিক্ষণ তিষ্ঠোয় না। শ্যামদাসের কাছে ডালির কথা বলবে, তার যন্ত্রণার কথা বলবে, ধম্মনদী অনুভবের কথা বলবে, শ্যামদাস বললে সে ডালির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তন্ময় হয় সে ভাবনায়। তারপর লোকের ঘরে গরু ঢুকিয়ে সন্ধেবেলায় নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে দাওয়া শূন্য, খেজুর পাতার তালাইটা একধারে গোটানো।

বিকেলবেলায় মেঘ আসে। বড়ই প্রয়োজন ছিল। ক'দিন নাগাড়ে রোদ পিপাসায় উবে গিয়েছে ক্ষেতের জল। বিকেলের জোর বর্ষণের সন্ধের মুখেই ঝিমুনি। অন্ধকারে জড়িয়ে আছে ঝিরঝিরানি, বাতাসে শীতলতার স্বাদ। ঘরে অটল লম্ফ জেলে বসে। বর্ষায় চাল নষ্ট হয়েছে, এক কোণে জল ঝরে, ওদিকটা কাদাটে হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি আবার নিজেকে ঝাঁকিয়ে জোরে নামতে পারে, অটলকে ঝামেলায় পড়তে হবে। ভাত রান্না করতে পারেনি বৃষ্টির দাপটে। দোকান থেকে মুড়ি এনে খেয়েছে। কত আর বসে থাকে। লম্ফটা নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

রাতের গভীরতার মাপ থাকে না। দরজায় শব্দ অটলের ঘুম ভাঙায়। লম্ফ জেলে 'কে' জিজ্ঞাসাতে ব্যস্ত শব্দ টোকর। খুলতেই জগা। ঢুকেই বন্ধ করে দেয়। লম্ফের লালচে আলো মানুষটাকে প্রত্যক্ষ করায়। একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথায় ছড়ানো চুলের রাশি, পাজামার উপর বুক খোলা শার্ট, বৃষ্টিভেজা, ন্যাতানো। সুখে নেই, উদ্বিগ্নতা এবং প্রতিনিয়ত ভয়ের তাড়না কপালের রেখায়, দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

'একট বিড়ি দাও দেখি।' ভিজে সিটিন্ গেলম। অটলের হাত থেকে বিড়ি নিয়ে লম্ফে জ্বালিয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দেয়, হুশ হুশ করে টেনে যেন তাপ সংগ্রহ করে।

'এলি কেনে তুই আমার কাছে!'

'তোমার কাছে ছাড়া আসব কোথা! হুলিয়া আছে। ধরার লেগে পুলিশ ওৎ পেতে আছে। যাক্ গো, খবর কী বল। শাঁখা কেমন আছে?'

'আমি যদি তোকে ধরিয়ে দি।'

'পারবে না তুমি।'

'পারতে হবে। না পারলে অধর্ম হবে।'

'তোমাকে অধর্ম করতে হবে না। ধরিয়েই দেবে। আর শালা জনালা ভাল লাগে না।' জগা পরাজিতের গলা করে সহানুভূতি কুড়ুতে চায়, 'তার আগে আমার কথার জবাব দাও—শাঁখা কেমন আছে? দেখা হয়েছিল?'

'ভাল।' অটলের গলা ভারী হয়, 'একটা মেয়েকে সারাজেবন কাঁদিয়ে যেছিস্! পাপ হছে না তোর। তার ফল ভোগ করতে হবে নাই! এই যে লুকিয়ে বিড়াছিস্। শাঁখাও এসে বলে গেল, তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে, তাহালেই শোধরাবি।'

'শাঁখা এসেছিল চকায়?'

'হ্যাঁ। তোর লেগে পুলিশের মার খেলম্ তার খপর করতে।'

'শুনেছি। কী করব, তাতে ত আমার হাত নাই। ডলিবৌ রুখেছিল?'

'হ্যাঁ। সেখানও এসেছিল।'

'ডলিবৌকে সাঙা করছ তাহলে?'

'নাই। গাঁ ছেড়ে চলে গেইছে। আমাকেও বলে যায় নাই।' অটলের বেদনার রুদ্ধপাক বাতাসটা যেন ঘুরপাক খায়। কাউকে বলে মন খালাস সে করতে পারেনি, কারও সহানুভূতিও পায়নি, কেউ তার হারানোর শোকের কথা জানতেও চায়নি।

'চলে গেল। তুমি আটকাতে পারলে না?'

'না।' অটল অসহায় মাথা নাড়া দেয়।

'কোন মুরোদ নাই। ধর্মের পায়ে মাথা কুটে পেলেট কী! লবডঙ্কা। আমার কথা শুনলে মেয়েমানুষ তোমার গা ন্যাওটা হয়ে থাকত।'

'তোর কথা—তোর অবস্থা তো দেখছি।'

'কী দেখছ? বুঝলে ডাকাতের অনেক বন্ধু। আমার কোন অসুবিধাই নাই যিখানে আছি। আমাকে পুষবেই, পরে ফয়দা হবে। শালা ডাক্তারের ঘরে যে ফেঁসে যাব—কে জানত।'

'তোর দলের ত সবাই ধরা পড়েছে। ছাড়া কেউ পায় নাই! পেঞ্চাদের পা গেইছে। পীরের মা—।'

'রাখ তো ওসব কথা।'

'তুই তাহালে ধরা দিবি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'আমি তোর কোন কাজে নাই।'

ব্যগ্র গলায় জগা বলল, 'আহা শুন, শাঁখাকে বলবে পরশু ভোরবেলাতে যেন শিবপুরের মোড়ে দাঁড়ায়। ভোর চারটের বাস ধরব। বুঝলে উকে নিয়ে কোলিয়ারির দিকে চলে যাব এ দেশ ছেড়ে। খেটেখুটে খাব। ও যেন দাঁড়ায়। সঙ্গে কিছু নিতে হবে না।'

'বলিস্ কী! পালাবি! তাহলে যে বললি ধরা দুব।'

'না। ধরা দিলে জেল। ফিরে সেই ডাকাতি করতে হবে। ভালমানুষ হতে চাইলেও এখানে পারব না। কেউ ভালমানুষ হতে দেবে না। পুলিশ টাকা চাইবে, টাকার জন্যে ডাকাতি করতে হবে। খানিদার মাল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে উসকে দেবে। দলের লোক বলবে বসে হাতপায়ে খিল ধরছে।'

অটল ভাবে, সবই সত্য। চেতন এসেছে জগার। ওকে ভালমানুষ হবার, এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া ধর্ম। তবু বলে, 'আমি কথা দিয়েছিলাম্ তোকে ধরিয়ে দুব।'

'তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি, শাঁখাকে নিয়ে পালিয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছি, ভালমানুষ হবার শেষ সুযোগ তুমি দেবে না? এতে যে তোমার অধর্ম হবে।' উত্তরহীন অটলকে, বলে, 'তাহালে ওই কথা রইল। শাঁখাকে বলবে। কেউ যেন আর টের না পায়। আমি চললম্।' বলে জগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

অটল দরজা বন্ধ করে। ঘুম আসে না। বড় মশার উপদ্রব। বাইরে আকাশের ঝিরঝিরানি বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। অটল ভাবে, শাঁখাকে নিয়ে চলে যাবে। নতুন সঙ্গ পাবে, নতুন জীবন গড়বে। আহা ধর্মনদী তো জগার মধ্যেও আছে। তার সব জল শুকিয়ে ফেলেছিল। জল টলমলে করে রেখেছিল অধর্মের নদীতে। তাই চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই। ভেসে গিয়েছে সব বোধ। সততা, ন্যায়, মানুষের উপর ভালবাসা এ সবের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে গিয়েছে। এবার ধর্ম-নদীর জল বইবে কলকল ছলছল। জগা দেখতে পাবে না, টের পাবে না, তবে বইবে। বৈরাগী বড় জব্বর কথা বলেছে। আহারে ধর্মনদী। কী মধুর শব্দ তার বহমানতায়। ওর ধারে গড়ে উঠবে বনানী, শান্ত সরল জনপদ। আকাশের সহস্র চক্ষু দেবতা তাই দেখে খুশী হবেন। জগাকে দেখে মনে মনে বলবেন, আহা জগার ধর্মনদী জেগেছে, ওর সব পাপ ক্ষমা করে দিলাম। অটলের এরকম ভাবনাটা তার বোধের অপরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও গড়ে, আনন্দ জাগে, নিশ্চিন্তের শান্তিময়তা তার শীতল

সর্বগ্লানিহর পেলব হাতের পালক ছোঁয়ানি আদরে একসময় ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সকালে ঘুম ভাঙে। বাইরে ধবধবে ফরশা, রাতে কখন মেঘ উধাও, স্নানস্নিগ্ধতায় পাখির ডাক, মানুষের সাড়া। প্রফুল্ল অটল মুখ ধুতে যায় পুকুরে। ভোলা বলে, 'শুনলে! দে'তো জগা রেতে ধরা পড়েছে। কী মার না মেরেছে। বেঁধে তাবাদে থানায় নিয়ে যেছে।'

শোনা যেন বিশ্বাস হয় না। প্রত্যুষ উৎফুল্লতা, শান্ত নিশির ঘুমে শ্রান্তি অপনোদন, সকালের নতুন প্রাণশক্তির অনুভব নিমিষে অন্তর্হিত। বেদনা ভেঙে দেয় বুক, কুঁজো হয়ে যেতে হয়। চোখের সামনে সব দৃশ্য অস্থির হয়ে পড়ে। চোখে এসে পড়ে জল। অটল কেমন করে বোঝায়, জগা পালিয়ে গিয়ে শাঁখাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। যন্ত্রণার তীক্ষ্ম শলাকাবিদ্ধতায় রক্তপাতের ধারা নামে ভাবনায়। আফশোষ হয়, সুযোগ পেল না। কাকে দোষ দেবে অটল। মাথার উপর ওই যে দূরে আকাশের নীলিমায় দিনমানে তো জ্বলন্ত সূর্য, রাতে নক্ষত্রের চোখ, ধর্মের দেবতাকে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায় না। আলোর অন্ধকারে বর্ষণে শীতঝরানিতে হিমকুয়াশায় শিশিরপাতে তাঁর চোখ অনায়াস প্রত্যক্ষ করতে পারে সূর্যশিখার মত। কড়ায় ক্রান্তিতে তাঁর হিসেব। পালিয়ে বাঁচবে কেমন করে। তবে দেবতা কি ক্ষমা করতে পারেন না! কে জানে! অটলের কতই বা জ্ঞান।

সারাদিনে অটল কত কথাই যে শোনে। জগার যাবজ্জীবন হতে পারে, ফাঁসিও হতে পারে। ফাঁসির আগে তার শেষ সাধ পূরণ করা হয় নাকি! জগা যদি বলে, শাঁখাকে নিয়ে তার ভালমানুষের জীবনের স্বাদ আছে, তাহলে ফাঁসি হয় কী করে। ফাঁসি হবে অথচ সাধপূরণের কান্ড থাকবে, এটা যে কী করে হয়। মানুষের সব চেয়ে বড় সাধ তো বেঁচে থাকার, পৃথিবীর বাতাস নেবার, সে সাধের চেয়ে বড় সাধ কী। মালতী সারাদিন কেঁদে কেঁদে ফিরেছে, অভিসম্পাত দিয়েছে যারা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের। সন্ধ্যায়ও কান্না থামেনি। বাতাসকে আকুল করে অটলের মধ্যে পাক দিতে থাকে সেই কান্নার কাঁপা সুর।

৭

জগার পাঁচ বছর, দলের অন্যদেরও ধীরে, ফনে, পেল্লাদ, ভাপি, গোলক এমনি করে আটজনের দুই চার বছর করে সশ্রম কারাবাসের সাজা হয়। সংবাদটা চকা গোপালপুরের কাছে কিছুটা গুরুত্ব পায়, আলোচনা হয়। এ সময় লক্ষ্মী বড় সদয়া, চতুর্দিকে ধান—অন্নময় অঞ্চল। ধানকাটার মরসুমে হেমন্তের সুখবৈভবের জন্য উদরপূর্তির পর অবসরে আমোদ এবং গালগল্প জমে ভাল। গোপালপুরে পঞ্চরসের আসর বসে, উপলক্ষে মেলা, আটদিন ধরে মাণ্টারকুমারের ম্যাজিক শো হয়, বিয়ে হয় বাবলার ছোট বোনের, ভুতোর ভাইয়ের। এ সময় ধান বেচে পুরোন দেনা শোধের ঝাড়া ভাব মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখে। অপরের কথা একটু দীর্ঘ সময় ধরে ভাবায়। সেঁতো জগার দলের সাজা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, দেশে শান্তি এল ইত্যাদির গল্পও তাই বেশ ক' দিন চলে। মালতীর হা-হুতাশ ব্যাপারটাকে জাগিয়ে রাখে। এদিকে অটলও হয়ে ওঠে একটা গল্পের চরিত্র।

অনাদি চক্রবর্তী কিশোর পুত্র চণ্ডীদাস আর স্ত্রীকে রেখে গত হন। মদ গাঁজা দুটোই সমানে চলত। ফরশা বর্ণটি তার ফলে কালিবর্ণ হয়, স্বাস্থ্য ভাঙে, অকাল-বার্ধক্য নামে শরীরে। অসুস্থ হয়ে ব্যর্থ চিকিৎসায় অর্থশ্রাদ্ধও করে যান ঢের। দুর্গামন্দিরের দশ বিঘে নিষ্কর জমির স্বত্বভোগ ছাড়া উপার্জন ছিল পুরোহিত বৃত্তি। শিবপুরে বেশ কিছু পরিবার তাঁর যজমান ছিল। গত হতে স্ত্রী শান্তি-ঠাকরুণ কিশোর পুত্রটিকে এই বৃত্তিতে নিয়োগের চেষ্টা করে। কিন্তু চণ্ডীদাসের লেখাপড়াপনার শুরু প্রাথমিকের গণ্ডী ডিঙোনর পরই। বারবার ফেল করে, স্কুলে না গিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানয়, জোর করে মায়ের কাছে টাকা পয়সা নিয়ে সিউড়ী কী আসানসোলে মামার বাড়ি চলে যাওয়ায় কৈশোর দিনগুলি পার করে। বাবার মৃত্যুর কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। মাকে শোষণ করেই তার দিনযাপন। শান্তি শিবপুরের দিনু চাটুজ্জেকে মাইনে দিয়ে দুর্গার নিত্যসেবা করায়, যজমান ঘরে কাজও করায়, নিজে গিয়ে উপস্থিত হয় অনুষ্ঠানে। পুরোহিত প্রাপ্য দানসামগ্রী নিয়ে আসে। দিনুকে তার ইচ্ছেমত একটা অংশ দেয়। এ ব্যাপারে অবশ্য দিনুর কোন ক্ষোভ থাকে না। অনাদি চক্রবর্তীর যজমানের কাছে প্রাপ্তি তার পরিবারই তো

ভোগ করবে। শান্তি পুত্রটিকে ধরে রাখার হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু স্নেহ বিষম বস্তু। তার কৃত্য কেবল কান্নাই দখলে থাকে। চণ্ডীদাস এতে বিরক্ত হয়। তারপর ঘরের চার ভরির মত সোনা আর নগদ তিনশ'রও কিছু বেশি টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। তিন বছর আগের ঘটনা। শান্তি খোঁজখবর চালায়, কাঁদাকাটা, এখানে ওখানে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া কী চিঠিপত্র দেওয়া, থানা পুলিশ, নানাভাবে খবর পেয়ে লোক পাঠান ইত্যাদিও কম করেনি, কোন খোঁজ নেই। শান্তি বিশ্বাস করে, তার চণ্ডীর সুমতি হবে, একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গোপালপুরে।

শান্তিঠাকরুণের সঙ্গে অটলের সম্পর্ক গাইগরুর জন্যে। গাংঠিপালে ওরও চরায়, বাছুর হলে দোহানও তারই কাজ। সকালবেলায় গরু খুলতে আর পৌঁছে দিতে যেতে হয়। ফাইফরমাসও সে খেটে দেয়, তো সে অটল শিবপুরে কোন গেরস্ত কী ঠাকরুণের না করে। তবে শান্তিঠাকরুণের বাড়তি আর একটা কাজেও তাকে সঙ্গী হয়ে সাহায্য করতে হয়। ঠাকরুণ মেয়েলী রোগের টোটকা ওষুধ দেয় পাঁচ সিকের বিনিময়ে। টোটকার জন্যে শিকড়বাকড়, পাতা, ছাল, ভেষজ বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফুল, ফল যোগাড় করতে হয়। উদ্ভিদের সন্ধানে ঠাকরুণ বেরুলে তার সঙ্গী হতে হয়। পয়সা দেয় তার জন্যে। সময় পেলে গল্পস্বল্পও করে। ঠাকরুণের গল্প পলাতক পুত্রটিকে নিয়ে। ঠাকরুণের অভঙ্গুর বিশ্বাস—ফিরে আসবে, ফিরে আসবে চণ্ডীদাস। অটলও বিশ্বাস করে, কারণ সে জানে ঠাকরুণের ভিতর ভিন্ন একটা শক্তি আছে। মেয়েমানুষ সহজ সাধারণ নয়।

শান্তিঠাকরুণের ভেতরে অটলকে নিয়ে মস্ত নির্মাণপর্ব কবে শুরু অটল জানে না। স্বপ্নাতীত সম্ভাবনা অনুভব কী অনুমানসাপেক্ষও হয়ে ওঠেনি এত মেশামেশিতেও। ইঙ্গিত কী তাকে বৈশিষ্ট্য দেওয়ার ঘটনাও নেই। সাধারণ জ্বর ঠাকরুণের। মাদুর বিছিয়ে চাদর ঢাকা নিয়ে দাওয়ায় শুয়ে, গরু খুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পড়েছিল, ফেরত দিতে এসে ওই অবস্থায় দেখে থমকাল অটল, 'ঠাকরুণ—হল কী! জ্বরজ্বালা।'

'হ্যাঁ, শোন্, তোর সঙ্গে কথা আছে।' অটল ব্যস্ততার সঙ্গে সামনে আসতেই বলল, 'বস্ এদিকে। অনেক কথা বলার আছে। তোকে একটা দায় নিতে হবে। আমি আর বাঁচব না।'

'কী যে বল। জ্বরজ্বালা আবার হয় না। নিজে ত কত কী জান।'

'জানি বলেই তো বলছি—মরণ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি রে—সে আসছে আমাকে নিতে।'

অটলের শুনে কষ্ট হয়।

'তোমার ছেলে একদিন ঠিক আসবে।'

'কিন্তু কবে, তা তো আমি জানি না। তার জন্যে এই ঘর, জমি, আমার টাকা গয়না সব তোর কাছে গচ্ছিত রেখে যাব। চণ্ডী এলে ফেরত দিবি।'

'কী বলছ ঠাকরুণ, এ সব আমি সামলাব কী করে।'

'খুব পারবি। গরুবাগাল তোকে করতে হবে না। বিয়ে করে সংসারও কর, খরচা করবি জমির ধান। সব চালিয়ে যা বাঁচবে তাই রাখবি। তোকে হিসেব দিতে হবে না। তুই স্বাধীন। সব ব্যবস্থা আমি করে যেছি লিখিত পড়িত।'

অটলের গায়ে যেন নরম শিকল এসে পড়েছে। সে শিকল আবার প্রাণময়, দিব্যি বিস্তার নিয়ে ঘিরে ধরছে। ঝেড়ে ফেলতে চায় সে, 'ও ঠাকরুণ এ তুমি কী বলছ।'

'চুপ কর। কথা শোন্।'

'তোমার পায়ে পড়ি। অসাধ্য কাজ আমাকে দিও না।'

'একমাত্র তুই-ই পারবি। তোকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাব। শোন্, এই বাঁশের ভেতর হাজার টাকা আছে। মরলে এই টাকাতে শ্রাদ্ধশান্তি করবি। গয়না আছে ঘরের কোণে মাটির তলাতে একটা পিতলের বাক্সে। ও তোর দেখার দরকার নাই—জেনে রাখ। দিগুকে বলে দিয়েছি ও দুর্গার সেবা করবে। জমি চাষে নরেন। ধান তুই বুঝে দেখে নিবি।'

'ঠাকরুণ ভেবে দেখ।' অসহায় কাঁপুনি অটলের।

'ভেবে দেখেই তো করেছি। প্রধান অবিনাশ, গোপীনাথ, চাটুজ্জেমশায়, নুটু কাল আসবে। আমার লেখা কাগজ আমি দেখাব। তোকে সবাই আমার চণ্ডীদাসের প্রতিনিধি বলে মেনে নেবে।'

অটল মাথা দোলায়। শীতসন্ধ্যা মুখেও সে ঘামছে। বলে, 'এ আমাকে কী ফ্যাসাদে ফেলছ। গাঁয়ে ঢেক লুকে আছে। দায় দিলেই নিয়ে নিবে।'

'সে আমি জানি। শোন অটল আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, না করিস্ না। আমি বলছি তোর ভাল হবে। তোর ধর্ম হবে, পুণ্যি হবে।' শান্তি ঠাকরুণ বলে, 'যা ঘরের আলো জ্বালা। তোর ঘরে কেউ নাই। একটা বকনা থালি। নিয়ে আমার গোয়ালে রাখ। আর তুই আমার কাছেই থাক।'

'কাল তোমার জন্যে ঘোষালডাক্তারের ওষুধ এনে দেব।'

'তোকে আর কষ্ট করতে হবে না। কাল গাঁয়ের লোক আসবে।'

'জ্বরে তোমার মাথার ঠিক নাই ঠাকরুণ। ঠিক কাজ করছ না।'

'তোকে না পেলে ঠিক কাজ হত না। হ্যাঁরে, তুই রামায়ণের গল্প জানিস্‌! রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, রাবণরাজা।'

'রামরাবণের যুদ্ধ।'

'শুধু যুদ্ধ নয়। রামের সিংহাসন ভরত রেখেছিল। রাম বনবাসে গিয়েছিল।'

অটল বলল, 'জানি।'

'তুই হলি সেই ভরত। আমি অনেক চিন্তা করে তোকে বেছেছি। আমার চোখ ভুল করে না।'

প্রধান অবিনাশ, সদস্য দুলাল, চাটুজ্জেমশাই, বলরাম, পিনাক রায়, গোপালপুরের গোপীনাথ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে শান্তিঠাকরুণ কথা বলে, তার লেখা কাগজখানা পড়ায়, সই করতে বলে সবাইকে, যদিও রেজিস্ট্রি নয়। মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধার সকরুণ কথা আদায়ে সকলেই স্বীকৃতি জানায়, অটলের দায়বহনে তারা সহায়তা করবে, গাঁ যাতে মেনে চলে তাও দেখবে।

কেবল নানু চক্রবর্তী আসে না। মামলায় সাক্ষী না দেওয়ার পর থেকেই রাগ। ঠাকরুণকে এ কাজে বাধাও দিয়ে যায়। নিজের দায়িত্বে রাখার প্রস্তাবও দেয়। ঠাকরুণ না করেছে।

জীবন বদলে যায় অটলের। সে বিস্মিত হয়েছিল, ভয় উদ্বেগে দায়িত্বের শৃঙ্খল দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল, বেষ্টনকে মনে হয়েছিল সাপপাক, নিদ্রাও চলে গিয়েছিল, কিন্তু পাওয়ার পর ঝটিকা ক্ষিপ্রতায় অনুভবগুলি অবসিত হয়। প্রফুল্ল পাখি শিস দেয় বুকের গভীরে। শান্তিঠাকরুণের আত্মা যেন ভর করে তার উপর কিংবা তার শক্তি উৎসের মুখটিকে প্রসারিত করে দেয়। সে যেন চক্রবর্তী পরিবারের একজন না হয়েও একজন, অধিকার নেই জেনেও অধিকারী। শান্তিঠাকরুণ মারা যেতে বালিশটা সে সরায়, ছিঁড়ে টাকা বের করে, লোক ডাকে, শ্মশানকৃত্য করে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে ভূমিকা নেয়, চকার নিজের ঘরটিতে তালা ঝোলায়, বকনাটা এখানের গোয়ালে ঢোকায়, ধানের হিসাব বোঝে কিষাণ নরেনের কাছে, দিগুকে পুজোর টাকা দেয়, গাংঠিপাল দেয় নবীনের ছেলেকে। লোকে কথা বলে, ননী চক্রবর্তীরই বেশি কথা, নানাভাবে বাধা দেওয়া, কিন্তু অবিনাশ সহযোগ সবই কাটিয়ে দেয়। নিজের প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত ব্যয় করে না, মনে মনে হিসেব রাখে সবকিছুর। দায়বহন যে এত সহজ, অহেতুক ভয় তাকে কাঁদিয়েছিল ভেবে নিজের শক্তির উপর আস্থাবান হয়। গাংঠিপালের বাগাল ছোঁড়ার অস্তিত্ব ভেঙে পুরুষ হয়ে সে দাঁড়ায়।

অটলের গল্প গ্রামজীবনের ধারায় মিশে গিয়ে নতুনত্বের ঝাঁজ রাখে না, রোমাঞ্চ

রাখে না। দারিদ্র্যপ্রাপ্তি, ভোগ সুখে ঈর্ষা জাগায়, ঈর্ষার টুকরো কথার তপ্ত অঙ্গার ছিটকে ছাটকে দেয় কেউ কেউ, তাতে ফোসকা পড়ে না অটলের। 'অনাদি চক্রবর্তীর বেটা', 'শালার তেল কত', 'বামুনের পোষ্যপুত্তুর' ইত্যাদির সঙ্গে, 'ভোগদখল তোর ভাগ্যেই লেখা ছিল,' 'কপাল করে এসেছিলিস্ মাইরি, কামিয়ে নে,' অটল শোনে। মানুষ তো কথা বলবেই। তার রাগ হয় না। হয়ত কখনও বলে, গেরস্ত ভোগ করছি ঠিক, দখল দুব না, ঠাকরুণের বেটা ফিরে এলে দখল দেবে। নীরব থাকাটাই তার কাছে বেশি। নানু চক্রবর্তীও তিক্ত কথা, খারাপ ব্যবহার, বিদ্রূপ, ঘৃণা ইঙ্গিত স্থায়ী রাখতে পারে না। অটলের নির্বিকারত্বে হার মানে, কিন্তু মরে না, সময় সময় ছোবল দিয়ে থাকে। রাতের বিছানায় অটল নিজে বলে, 'দেখো বাবা ধম্ম, তুমার তো হাজার চোখ, দেখো, ঠিক রেখো আমাকে। ঠাকরুণের কথা যেন রাখতে পারি। যেন লোভে না পড়ি। এ আমার নিজের ধন নয়। আগলাচ্ছি কেবল। তোমার হাজার চোখে ত দেখতে পেছ ঠাকরুণের বেটা কোথা আছে—তাকে খবর দাও। সে এসে বুঝে নিক।' ভাবে চণ্ডীদাস যে কবে আসবে! ঠাকরুণের অনেক বিদ্যে জানা ছিল, যখন বলেছে আসবে, তখন আসবে নিশ্চয়ই একদিন।

চকার মানুষজন, সেই পরিমণ্ডল, তার সঙ্গে ব্যবহারের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী শব্দ সবই এখন বহু দূরবর্তী হয়ে গিয়েছে। অটলের টের পেয়ে কষ্ট হয়, সেই অটলই আছে, লোকে কেন অন্য রকম আচরণ করে। 'তুই' বলা ছেড়ে এখন 'তুমি' বলে প্রায় লোক, সম্মান সম্ভ্রমও দেখায়, কথায় গুরুত্ব দেয়।

চকার ভোলাদের ঘরে গিয়ে অটল বলে, 'হ্যাঁরে ভোলা আর যে যাস্ না!'

'টাইম কোথা কাকা?'

'আমি তোদের পর হয়ে গেলাম।'

ভোলা হাসে, 'তুমি এখন গোপালপুরের বামুন ঘরের লুক।'

'দেখ বৌদি ভোলা কী বলছে!'

'ঠিকই তো বলছে। তুমি কী আগের পারা আছ ভাই। নিজে মানুষ বুঝতে পারে না, বদল লোকে বুঝে।'

'বৌদি তুমিও আমাকে তাহলে ভুল বুঝছ।'

'ভুল কিসের! তোমার আমার কারও ভুল নয়। এটিই নিয়ম বটে। দুনিয়া এরকমই চলছে। মানুষ কী একরকম থাকে চিরকাল!'

দুনিয়ার চলার নিয়মে যেন অটলের কিছু যায় আসে না। আক্ষেপে সে বলে, 'সবাই ভাবে আমি ঠাকরুণের মত মালিক। ধার করতে আসে, ফাঁকি দিতে চায়,

বলে মুক্তেত অনেক ধন পেয়েছিস্, দানধ্যান কর, মালতী টাকা চাইছিল, ভুতো বলছিল মদের দাম দে, সরস্বতীপুজোর চাঁদা চাইতে এসে ছেলেরা বলে, এক্শ টাকা দাও, নিজের দিছ নাকি, বুড়ীর এত পেলে—কী করে বুঝাব আমি আগুলছি। জাগালি কী ফসলের মালিক হয়, না জমির মালিক হয় ?'

'ঠিক কথা ভাই। স্বার্থে ঘা লাগলে মানুষ অমন কথা বলে।'

'তোমার মত সবাই যদি বুঝত।'

মিতি এসে দাঁড়ায়, 'ওমা পিছুতে যে সূর্য উঠেছে। বামুনপাড়ার লুক এসেছে আমাদের চকায় !'

অটল বেদনাভরা চোখে তাকায়। কোন কথা বলে না।

'ভাল আছ ? নিজের ঘর দেখ, চালের বাতা নিয়ে সব উনুন ধরাছে।'

অটল দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বলে, 'থাকি না, দেখব কী করে !'

'বড়ঘর পেয়েছ। এ ঘর থাকল আর গেল !'

ভোলা বলল, 'শিবপুরে কলকাতায় যাত্রা হবে—যাবে ত !'

'ঠাকরুণের ঘর দেখবে কে ? তোরা সব যাবি ?'

'হ্যাঁ। দু'দিনই। সিজিন টিকিট কেটেছি।'

অটল বলে, 'ও বৌদি চা কর।'

'সে বলতে হবে না। চাপাছি। কিন্তু দুধ নাই—রুচবে ?'

অটলের দুঃখ স্বর বের হয়, 'তুমিও আমাকে দুষছ !'

মিতি বলল, 'অয় দেখ, যা বলতে আসা। শুনলম, ডলি ওর দিদির দেওরকে সাঙা করেছে। ধজু সিউড়ীতে শুনে এসেছে ?'

ধক্ করে ওঠে অটলের বুক। সে কোন কথা বলে না। শুধু শোনে ওদের আলোচনা। হারার এই ঘরের; বাঁশঝাড়ের কী হবে, সাঙা করলে ডলির অধিকার থাকে না, ছেলেটা বেঁচে থাকলে পেত ইত্যাদি কথা ভোলার মা, মিতি শোনায়। তার মধ্যেই চা খাওয়া হয়। অটল চকা এসেছিল একটুকরো আনন্দ কুড়ুতে। চৈত্রবিকেল লাল আবির রৌদ্রকে ঝরা দুঃখের মালিন্য দেয়। তার কষ্ট হয়। দিন নয় ডলি যেন পশ্চিমে ডুবছে।

চকা ঘুরে শ্যামদাস এসেছে। স্নান সারা। কপালে গলায় উর্দ্ধমুখ বাহুপাশে চন্দন ছাপ, কাঁধে সেই ঝোলা, খঞ্জনি, লুঙ্গির মত করে পরা আধা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, মুখে সেই মধুরতাপ্লাবী, কিশোর কোমলতা রেশমী রুমাল হয়ে উড়ছে কপালে গলায়.

চিবুককে। খেয়ে ঢকার তার ঘরের দাওয়ায় অটল বিশ্রাম নিতে দেখেছিল, তারপর ফিরে দেখেছিল চিকটি নেই, আবার ফিরে এসেছে, পায়ের তলার চাকা বুঁক টেনে এনেছে।

শ্যামদাস ঘর দেখে, দেওয়াল, চাল, বাইরের বারান্দা, একপাশে বাঁধান তুলসী মঞ্চ নিয়ে আয়তকার উঠোন দেখে, উঁকি বাড়িয়ে কক্ষগুলোর ভিতর খাট, বাক্স-প্যাটরা আসবাবপত্র দেখে, গাইজোড়া বকনাটাকে দেখে, ওদিকের পেঁপেগাছ, পেয়ারা আর সজনেগাছ দেখে, তারপর দেখে অটলকে।

ঝোলা নামিয়ে সিমেন্ট বাঁধন দাওয়ায় বসে। উঠোনে পায়রা চরছে। সেদিকে চোখ রেখে বলে, 'বেত্তান্ত সবই শুনেছি, রাধেকৃষ্ণ, এখন চাক্ষুষ হল বাইরের রূপ—অপরূপ বাকী থাকল। ভিতর দেখা কী, চাট্টিখানি কথা?'

'ভেতর কী দেখবে! দিব্যি ছিলম, ঝামেলায় আছি।'

'ঝামেলা বলছ বটে, তবে সুখও ভোগ করছ, তোমার কথার গন্ধ শুঁকে বুঝছি। তবে হ্যাঁ, পরীক্ষেতে পড়েছ। কী লিখছ কে জানে! খাতা দেখবে এগজামিনার, আমরা দেখব পাস না ফেল।'

'তোমার কথার হালহদ্দ পাই না।'

'আমিই কী পাই নাকি যে তুমি পাবে! রাধেকৃষ্ণ!' শ্যামদাস হাসে। বলে, 'ভাল কথা, ডাকাত জগা জেলে আর তুমি এখানে। জগা তোমাকে টানতে পারল না আর তুমিও ওকে রাখতে পারলে না।'

'কথা শুনলে ত রাখব।'

'ধম্মকথা কে শুনতে চায়। তবে তোমার হার।'

জগার অধর্মের নদীতে বান, ধর্মনদী শুকো। অটলের মনে পড়ে। ব্যগ্র হয়ে সে বলে, 'জান ত সেদিন তোমার চালের ভাত খেয়ে বেরুলম, তুমি শুয়ে থাকলে, যেতে যেতে নিজের মধ্যে ধম্মনদী দেখতে পেয়েছি।'

'ভাগ্যিমান তুমি, বুকে আনন্দ নদী দেখেছ। সে ধম্মনদীর জল, আহারে আনন্দ, বাতাস উথানের আনন্দ, আলো আনন্দ, দুকুলের মাটি আনন্দ, দু' পাড়ে গাছ আনন্দ।

'কলকলানি ছলছলানিও শুনেছি।'

'কলকল ছলছলও আনন্দ। খালি আনন্দ লহরী।'

'কিন্তু আর শুনি না, দেখি না। কেনে?'

'এ রহস্যি জানা নাই বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ। তবে রইছে তোমার মধ্যে। যখন তখন দেখতে পেলে শুনতে পেলে তুমি যে আর মানুষ থাকবে না।'

অটল নির্বোধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

শ্যামদাস বলে, 'ছাড়ান দাও উসব। পরীক্ষে কেমন দিছ? বুঝতে পারলে না পরের জিনিস নিয়ে পড়ে আছ, মনে হচ্ছে না তোমার নিজের?'

'তা কেনে হবে? ঠাকরুণের বেটা এলে নিশ্চিন্ত। লোকে আমাকে দুষছে। কিন্তু তুমিই বল ঠিকঠাক তুলে দিতে হবে কী না। পরের ধন উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কোথা, ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারি কই!'

শ্যামদাস বড় বড় চোখ করে শোনে, 'তোমার নিজের ঘর?'

'তালা ঝুলিয়ে এসেছি। কাজ শেষ হলে ধুঁয়ে ঢুকব উখানে।'

'বিয়ে সাদি করবে না?'

'ঠাকরুণ বলেছিল করতে। কিন্তু ওদিকে মন দেবার অবসর কুথা? কত কাজ! গাইয়ের শরীর ভাল নাই দেখতে হচ্ছে, চাষে নয়েনের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে, দিগু ঠাকুরের কথা শুনতে হচ্ছে, ঠাকরুণের সংসার নিয়েই সামাল সামাল। আবার বিয়ে করলে—।'

শ্যামদাস থামিয়ে দেয়, 'রাধেকৃষ্ণ, তাহলে গাঁয়ে ভিক্ষেট সেরে নিই।'

'এখানেই সেবা করবে।'

'সে আর বলতে! আয়োজন কর বাবাজী!'

'দেখো সেদিনের মত পালিয়ে যেও না আবার।'

শ্যামদাস বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন কথা বলতে চেয়েছিলে, শোনা হয়নি। পরে যখন তখন খিঁচ খিঁচ বাজত বটে, বলতে পার তার লেগেই তাড়াতাড়ি আসা!'

ডলির কথা বলতে চেয়েছিল। সে তো এখন অন্যের বৌ। বছর ঘুরে গেল। কথা শেষ। অটল মাথা নাড়া দিল, 'সে কথা কী আর পড়ে আছে।'

'উড়ে গেইছে কালের ডানায়! রাধাকৃষ্ণ। তবে সৃষ্টি ত হয়েছে নতুন কথা— তাই বলবে।' শ্যামদাস দাঁড়ায় না, 'চলি তাহলে।'

শ্যামদাস ভিক্ষে করে ফিরে আসে, তৃপ্তি করে খায়, রাত কাটায়, নানান গল্প হয়, তারপর সকালে, আবার আসব, রাধেকৃষ্ণ বলে বেরিয়ে পড়ে। পায়ের তলায় চাকা, ড্রাইভার যেদিকে নিয়ে যায়, যাবে। অটল ভাবে, আহা তার পায়ের তলায় যদি অমন চাকা থাকত, অমন যদি ঘুরতে পারত।

শাঁখার বিয়ের সংবাদ পায় অটল একদিন। শিবপুর থেকে সাইকেলে পাজামা শার্ট পরা একটা ছেলে এসে বলে যায়। বুধবার বিয়ে। শাঁখা যেতে বলেছে।

'শাঁখার বিয়ে!' অটল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ ওর নকড়াটির মামী ঠিক করেছে। তাহলে চললম্—যাবে।'

ছেলেটা বেরিয়ে যাওয়ার পর অটলের মনে হয়, ভালবাসা তাহলে এমন! এদিকে জগা জেলে রয়েছে। খবরও পাবে না। বিষাদের কালো ডানা আবৃত করে দেয় সব ভাবনা।

শাঁখার বিয়েতে অটলের যাওয়া হয় না। কালী ভটচাজ মারা গেলেন সেদিন বিকেলে। নব্বইয়ের মত বয়স হয়েছিল। প্রবল দাপুটে মানুষটি জীবন্মৃত হয়ে শয্যালগ্ন ছিল দু'বছর। সংসার দেখত না। সেবার জন্য পালেদের রেবতীকে রাখা হয়েছিল। মানুষটার স্মৃতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল, চেতনাও ছিল না, অস্তিত্বও গাঁয়ের লোকের কাছে ছিল না। মৃত্যু এসে জানিয়ে দিল কালী ভটচাজ বেঁচেছিলেন। অটলের কোন ভূমিকা নেই, তাকে শ্মশানযাত্রীও হতে হবে না। সন্ধের অনেক পরে বক্রেশ্বর শ্মশানে মড়া নিয়ে বের হল শবযাত্রীর দল। সে কেমন করে বিয়েবাড়ি যায়। রাতে শুয়ে তার মনে হল, শাঁখা সুখী হোক। ঠিক করেছে মেয়ে। নিজের জীবন এক অমানুষের পায়ে বলি দিলে মূর্খামিই হত। সে শিবপুরে গিয়ে দেখা করবে।

অটল শিবপুরে গিয়ে শাঁখার দেখা পায় না। শ্বশুরবাড়িতে শাঁখা। তারপরও বারকয়েক সে যায়, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে শাঁখা এসেছে কী না! না, খবরও জোটে না। শাঁখা নিজেও আসে না, কী খবর পাঠায় না। সুখে আছে শাঁখা ভেবে অটলের মন থেকে শাঁখা মুছে যায়।

চণ্ডীদাস ফিরে আসে না। বছর পার হয়ে যায়। গাঁ-মানুষের মুখে ওই সংক্রান্ত কথাও নেই, কিন্তু অটলের মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন ধারণার শিখাটি থেকেই যায়। তার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ফরসা লুঙ্গি, গেঞ্জি, শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল বুঝি সে বামুনপাড়ারই মানুষ। চকার জীবনদীনতা, অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্তির হীনম্মন্যতাবোধ এখন নেই। প্রধান অবিনাশ, সুদ ব্যবসায়ী বঙ্কু, সহদেবমাস্টার, নটুগেরজ, পিসি তারুবালা, অন্য ঠাকরুণেরা অটলকে তাদেরই একজন মনে করে। বামুনঠাকরুণ অটলকে সব লিখে দিয়েছে, এটাই কথা। অর্থ এক ধরণের কৌলিন্য দেয়। কথাবার্তাতেও পরিবর্তন এসেছে অটলের। ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, ধর্ম মান্য কিংবা ভয় যাই হোক, তার মধ্যে সমান ক্রিয়াশীল। বুদ্ধিবিচারের বিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্ব এসেছে, বাগালের যা ছিল না।

শুধু নান্দু চক্রবর্তী ব্যতিক্রম। মানুষটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, শুধু নান্দু নয়, ওর ছেলে বৌ ঘরের কিষাণ বাগালকে পর্যন্ত বিষাক্ত করে রেখেছে। এড়িয়ে গেলেও ঝাঁপায়। অটলকেই গা বাঁচাতে হয়, আঘাত সইতে হয়।

গাঁয়ের তহশীলদার, সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি পাওয়ার পর ভূমি-সহায়ক ভুবনপতি রায়। খাজনা আদায় করে জমিজমার। জমির বিক্রয় হস্তান্তর, শরিকী ভাগ, মামলা মোকদ্দমা, মারদাঙ্গা, দলিলপরচা, দাগ খতিয়ান ইত্যাদিতে টইটম্বুর অভিজ্ঞতা। বলে, 'জমি যার অধিকারে সেই মালিক। কাগজের দাম খতম। ভোগ-দখলই সব। মাটি থেকে কাউকে তোলা সহজ কর্ম নয়। বর্গায় তো কাগজে কলমেও অধিকারী। না বর্গা হলেও ভোগেও রাইট জন্মায়।'

অটল এসব শোনে, তাকে শোনান হয়, খুচরো প্রাপ্তির জন্যে তোয়াজে অধিকারের গর্তটিতে ঝাঁপানর প্রলোভনও জাগান হয়, তবে বর্গা অপারেশন ক্যাম্প বসছে না, অটলও নাম চাপাতে যাচ্ছে না, চণ্ডীদাসও আসছে না তাকে উৎখাত করতে। কিন্তু পরধন ভোগের সচেতনতার মধ্যেও নিঃশব্দ অধিকার রস নিষিক্ত হয়, রস পুরু হয়ে চটচটে আঠা, তখন লড়াই, অজস্র জটিলতা, ক্রোধ, হিংসা। অটল না চাইলেও ঠাকরুণের ঘরের প্রতি বস্তুই মানসিকতায় প্রভাব ফেলে, মায়া বিস্তারিত হয় অজান্তে, কর্তৃত্বের মোহের জন্ম দেয়। অটল বোঝে না। বোঝার সঙ্গতি হারানর জন্যই তো মানুষের এমন জীবন বৈচিত্র্য।

শিখা সজাগ করে দিতে অটল শিখাশক্তির অন্য রকমের প্রচণ্ডতায় আক্রান্ত হয়।

শিখা বেচু ঘোষালের মেয়ে। একান্তরে বেচু খুন হয়। সুদ বন্ধকীর কারবার ছিল। বেচু খুনের সঙ্গে সংসারও খুন। সংসারে সাহায্যকারী ভাই কিংবা অন্য নিকটজন ছিল না। স্ত্রী অনিতা তিনটি মেয়ে নিয়ে ঘোর দুর্দিনে পড়ে। সামান্য জমির উপর নির্ভরতা। মুড়িভাজুনি সাজে। বড়মেয়ে রেখার বিয়ে বিনাদানে বিনাপণে হয়ে যায়। বেচু ঘোষাল রূপবান পুরুষ ছিল। তিন কন্যাই রূপবতী। মেজ লেখা পনের বছর বয়সে মারা যায়। ছোট শিখা। সেরা সুন্দরী সে। অভাবের সংসারে সুন্দরীর উপর ঝড়ঝাপটা বেশি আসে, অনেক পুরুষেরই কামনা আগুন জাগে, নানাভাবে গ্রাসবাঞ্ছায় জাল এবং ফাঁদের নির্মাণ চলে, পা পড়ে আটকানও ঘটে থাকে। রূপযৌবনের সচেতনতার সঙ্গে বাড়তি সুযোগে তা ব্যবহার করার প্রবৃত্তি শিখার মধ্যেও কিশোরী অবস্থাতেই গড়ে ওঠে। শরীরের ক্ষুধা, সাজগোজের ক্ষুধা, ভাল খাদ্যের ক্ষুধার সম্মেলনে গাঁয়ের যুবকবৃন্দকে তার চারপাশে নৃত্যরত করার খেলা চালায়। তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়ে যায়

নায়ক। বঙ্কুর বড় ছেলে ফটিক। বঙ্কু দু' পুরুষের ধনী, জমি, সুদের কারবারে ফাঁপান অবস্থা, গাঁয়ের রেশন ডিলার, ভোটে না দাঁড়িয়েও পঞ্চায়েতে প্রভাব প্রতিপত্তি। ধনবৃদ্ধির নেশায় প্রেমের দেবতার অস্তিত্ব তার কাছে বিন্দুবৎ। প্রেম পেট ভরাবে না, পেট ভরাবে টাকা, অন্ধকারে সব মেয়েমানুষই সমান, রূপ তো বাইরের লোককে দেখানর জন্য ইত্যাদির সঙ্গে বঙ্কুর পুত্রবার্তায় এও জানা আছে বেচু ঘোষালের ছোট বিটি কার কাছে শাড়ি নিয়েছে, কে মিষ্টি খাইয়েছে, শিবপুরের মোড়ে কার কার সঙ্গে চলিয়ে বেড়াচ্ছে। শাঁসাল বলেই ফটিককে একটু বেশি আঁকড়েছে এই যা। ফলে লক্ষাধিক টাকার দেনাপাওনা নিয়ে ইলামবাজারের এক কাঠের ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেয় চটজলদি। কালো মোটা মেয়ে, ফটিক না করতে পারে না। শিখা ব্যবস্থাও সে করে ফেলে। বোলপুরে রেলের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পোস্টিং অণ্ডালে—হীরেনের সঙ্গে সম্বন্ধ দেয়, সহায়তা করে; বিয়ে হয়ে যায়। খুব সহজে সমাধান হয়ে গেল অংক, এমন আত্মতুষ্টি বঙ্কুর অবশ্য দু'বছর মাত্র স্থায়ী হয়। শিখা গাঁয়ে ফিরে আসে। তার গর্ভে কোন সন্তান আসেনি। স্বামী বরাবরই এক বিহারী বিধবা যুবতীতে আসক্ত ছিল। সেটা বেড়েছে। ফলে মায়ের ঘর। ডিভোর্সের মামলা করবে এরকম মতলব।

শিখার যৌবন দ্যুতির ঘাটতি ঘটেনি দু'বছরে। ধবধবে ফরশা বর্ণ, মাথায় ঘন কালো চুল, নীল ঘেঁষা চোখ, মুখমণ্ডলের শৈল্পিক টান, লাবণ্য, রতি ছন্দের চমক স্তন কোমর নিতম্বে পুরুষ কামনার শিকড়ে টান এবং উৎক্ষিপ্ত করার যে শক্তি ছিল তাতে চাতুর্য শিক্ষণশৈলী আরও গাঢ়ভাব এনেছে। রূপবতী বাঘিনীর শিকার কৌশল নীল চোখে জ্বলে, নিজে না পুড়ে অপরকে পোড়ান অগ্নিসত্তায় ভাস্বর হয়।

ঠাকরুণের ঘরের পাশেই বেচু ঘোষালের ভিটে। মাটির ঘর, খড়ো চাল মাটির পাঁচিল ডিঙিয়ে ঠাকরুণের উঠোনে ডালপালা বিস্তৃত করেছে। পাতকুয়োর কাছে পেঁপেগাছ। মাঝে সামান্য পাঁচিলের ব্যবধান ঘুচিয়ে শিখা আসার পর অটলের সঙ্গে ও বাড়ির যোগাযোগ বেশি হয়েছে। অনীতাঠাকরুণ এটা ওটা ফাইফরমাস করাত, এখন এটা সেটা নিতে আসে, চাল ধার দেওয়া থেকে কাঁচালঙ্কা, শোধও দিয়ে যায়, আবার কোন কোনটি ভুলে যায় কিংবা দেয় না, অটল চাইতেও পারে না। শিখা প্রায় এসে গল্প করে। কথা সেই বলে বেশি। ইলামবাজারের কথা, অণ্ডালের কথা, তার স্বামীর কথা, বিধবা বিহারী যুবতীর কথা। শিখার মুখের আকঢাক নেই, সে তার ক্রোধ, স্বামীর পরস্ত্রী আসক্তি সবিস্তারের সঙ্গে তাদের দাম্পত্য

ব্যবহারের খুঁটিনাটি বলাতেও ঠোঁট সমান সচল রাখে। অটল জাতে নিচু, বামুনের মেয়ে ঠাকরুণ, তার স্পর্শযোগ্য নয়, কামনা জাগা পাপ, নারী বিষয়ক কথার রস আস্বাদনও অন্যায়. সে বোঝে, সম্ভ্রমবোধ রাখে, কৃতার্থ হয় ঠাকরুণ তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে না বলে, কিন্তু শিখা যে সমান্তরালে আনতে চায়।

'তুমি আমার দিকে তাকাতে পার না কেন, সুন্দরী বলে।'

'কী যে বল। তুমি ঠাকরুণ বট, অমন করে আমাদের দেখতে নাই।'

'দেখবে। আমি বুঝতে পারি তুমি ভয় পাও। অথচ দেখতে তোমার খুবই ইচ্ছে হয় ভেতরে ভেতরে।' 'অনেকদিন তো বৌ মরেছে। আর কোন মেয়েমানুষের কাছে যাওনি ?'

'না।' অটল ফ্যাকাশে মুখ তোলে।

'যেতে তো ইচ্ছে করে। বেটা ছেলে বট।'

'ওসব কথা বলতে নাই ঠাকরুণ, অধম হয়।'

'ইস্ অধর্ম! ইচ্ছেকে চাপা দিয়ে রাখাটাই পাপ।'

অটল চোখ তোলে। যুবতীর ঠোঁটে হাসি, আঁখিতে রহস্যময় কামঘনত্ব। সে চক্ষু নত করতে পারে না, যেন সম্মোহন শক্তির পরিধিতে প্রবেশ করেছে।

'তুমি নিজেকে নিচু জাত ভাব। জাত আবার কী। পুরুষ বট। জান তোমার জন্যে আমি ভাবি। আচ্ছা, 'লোকে তো আমার বদনাম করে, বলে নষ্ট মেয়ে। বলে না ?'

'বলে নাকি ?'

'সত্যি কেউ বলে না ?' শিখা বিস্ময় টেনে ছেড়ে দেয়, আমি নানাজনের সঙ্গে মিশি, সাজিগুজি, বেটাছেলেদের সঙ্গে হাসাহাসি করি। তোমার রাগ হয় না ?'

'রাগ! আমার রাগ কেনে হবে ঠাকরুণ!'

'ঢঙ্ করো না তো, আর ঠাকরুণ কিসের! শিখা বলতে পার না। মনে মনে ত বল। আমি বুঝি না ভেবেছ।' শিখা হেসে ফেলে কাচের চুড়িপরা হাত বাজায়, 'ভয় নেই গো, কেউ জানবে না।'

শিখা শুধু কথায়, চাউনিতে, শরীরের মুদ্রায় নয়, রান্নাকরা তরকারি দিয়ে যায়, চা করে দেয়, নিজেও খায়, একটা ব্লাউজ কিনব বলে টাকা নেয়, 'ও মা ঘরের কী দশা' বলে গুছিয়ে রাখে। যখন তখন আসায় ঘরে ছড়িয়ে যাওয়া মেয়েলী গন্ধে অটলের নিজেকে প্রতিরোধের শৃঙ্খলটি ক্রমশঃ আলগা হতে শুরু করে।

শেষ অগ্রহায়ণের বিকেলের মরা রোদে দাঁড়িয়ে যৌবন সোনার মেয়ে একদিন বলে, 'সন্ধেবেলায় তোমার ঘরে ফটিকদা আসবে আমার সঙ্গে গল্প করতে, বুঝেছ!'

অটল ভাবে, তাহলে উদ্দেশ্য এটা। সম্পর্ক গড়ার মধ্যে এ মতলব কাজ করত। জমি তৈরী করছিল মেয়ে, অটল বিব্রত বোধ করে, 'লোকে আমাকে দুষবে।'

'দোষ করব আমি, আর দুষবে তোমাকে! কী যে বল। কেউ টের পাবে না অন্ধকারে। বেচারা আমার জন্যে কাহিল।' শিখা শব্দ করে হাসে. শরীরে মোচড় দেয়, নীলচে চোখের ভ্রূ রেখার চমৎকার এক বিভঙ্গ গড়ে ওঠে। তারপরই উৎসারিত হয় বেদনাঘনত্ব. 'আমারও শরীর আছে. বেঁচে থাকতে হবে. ফটিকদা ডিভোর্সের মামলায় সাহায্য করবে যে দেখবে তাকে দেখতে হবে না—বল।'

অটলকে যুক্তি মানতে হয় কিংবা এও এক মন্ত্র—স্বরপাতে বিমুগ্ধতার স্নান হয়। তারপর রুদ্ধদ্বার কক্ষটিতে নারীপুরুষের মিলনপর্বের কথার অবোধ্য আভাস. টুকরো শব্দ কী নৈঃশব্দ্য থেকে তার মধ্যে চিত্রণ ঘটে উন্মাদ সঙ্গমক্রীড়ার নানান মুদ্রা, যা জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে চাক্ষুষ করে. তার পৌরুষ ইন্দ্রিয় ফেটে পড়তে চায়. ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, শীতল সন্ধ্যা দগ্ধ করে, অবৈধ, অন্যায়, ধর্ম অনুগামী নয়. পাপাচার বোধে আসে না। কামদেবের পুষ্পিত ধনুঃশরের উপর্যুপরি হানায় সুগন্ধে, আরও মাদকতায় সে কাম বাণাঘাতে ধ্বস্ত হয়। ওরা চলে যাবার সময় কী যেন বলে যায়. কানে ঢোকে না। অবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিছানায় শুয়ে সে মনেপ্রাণে শিখাকে কেবল কামনা করে যায়।

শিবপুরে বিকালের বাসে ডলি নেমেছে. চকা আসবে। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ছোট কাচের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। অটলের দেখামাত্র ঝিকিরমিকির, চোখেমুখে চিনতে না দেবার জন্যে আলোআঁধারি রঙের দ্রুত প্রেক্ষপণের চঞ্চলতা—স্থির হতে সে যেন চেনে ডলিকে। শীতের দিনের স্বল্পায়ু বিকেল হিম কাহিল. শেষ রোদের লালিমায় দুঃখছায়া, বাতাসে রুক্ষশুষ্কতায় ধূলিমলিনতায় প্রকৃতির বিমর্ষজড়তা. যা মানুষে প্রভাব ফেলে. অটলের সেটা মুছে চনমনে ভাব আসে। সে দেখে ডলির ঘাড়ে খসা ঘোমটা, ঝকঝকে মুখমণ্ডল ভরাট, তেলাভ মাংসল, গলায় সোনালী রেখা, কানে দুল, হাতে চুড়ি। বয়সের নিম্নগামিতায় রূপ যেন ঢাকা আঁচল সরিয়েছে. গোলাপী শাড়ী ব্লাউস. লাল চাদর, পায়ে চটিতে নতুন বৌ মানুষ।

অটল সামনে হতেই ডলির ঠোঁটে কাচের গ্লাস আটকে যায়। 'কখন এলে?' জিজ্ঞাসায় বলে. 'এই মাত্তর। সিউড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে, বাস ছিল না। এই যে দেখ—' বিপরীতে বসে থাকা যুবকটির দিকে তাকায়। অতি ব্যস্ততা অতি সহজতা ফোটে নড়াচড়ায়। বলে. 'চকার লোক।'

যুবকটি হাসে। কালো বর্ণ, খোদাই করা মুখচোখ, স্বাস্থ্যবান, মাথার কোঁকড়ান চুল, হাফশার্টের উপর নীল সোয়েটার, গলায় মাফলারের প্যাঁচ, হাতে ঘড়ি, কালো মোজাপরা পায়ে বুট জুতো। ভদ্রতা দেখায়, 'চা খাবেন ?'

অটল না বলার আগেই ডলি বলে, 'বল না চা দিতে।' অটলকে দেখে, 'সিউড়ীতে চাঁদুর কাছে শুনলম বামুনদের ঠাকরুণ সব তোমাকে দানপত্র করে দিয়েছে।'

'আমি দেখভাল করি। ঠাকরুণের ছেলে ফিরলে সব উর।'

'আবার ফিরেছে। বেঘোরে কোথা মরেছে দেখ গা।'

ডলি স্বামীকে নিয়ে অটলের সঙ্গে হাঁটে। একবার এসেই সে কত খবর সংগ্রহ করে ফেলেছে। জগার জেলপর্ব শেষ হয়ে আসছে, ধীরের সাজা কম ছিল, ছাড়া পেয়ে গাঁয়ে না এসে বোনের বাড়িতে উঠেছে, পেহ্লাদ খোঁড়া পা নিয়ে ভিক্ষে করে সাঁইথিয়া বাজারে, মালতীর বড়মেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল মুচিদের পবনের ছেলের সঙ্গে। অটল সব শোনে। গোপালপুরের বামুনপাড়াকেন্দ্রিক জীবন, ঠাকরুণের দায়িত্ব বহনের মগ্নতায় এ সবই গুরুত্বহীন। ডলি এসেছে ঘর বিক্রি করে টাকা নিয়ে যাবে। হারার যখন কেউ নেই, সেই তো মালিক। এও অটলের প্রতিক্রিয়াহীন শোনা কেবল পাশে হাঁটতে হাঁটতে। তবু ডলির সেদিন না বলে চলে যাওয়ার অভিমান, ভালবাসার স্মৃতিকাতরতা, অন্য পুরুষের নারী হয়ে যাওয়া প্রেমিকার জন্যে প্রণয়শোক, রূপ ফিরে পাওয়া ডলির যৌবন ভোগ কামনা মিলেমিশে সে স্পষ্ট টের পায় না, কিন্তু তারই ক্রিয়াশীলতায় অভ্যন্তরে তুমুল আলোড়ন তোলে, যার বিস্ফার নেই : আঘাতের প্রবলতা আছে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার ত্রাস আছে, ঘরে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় যা কান্না হয়ে ঝরে।

শিখা এসে বলে, 'ওমা আলো জ্বাল নাই। আঁধারে বসে আছ। ঘর সব খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রান্নাবান্না করবে না ?' সাড়া না পেয়ে শিখা আলো জ্বালায়। জানলা বন্ধ করে। ঝুঁকে বসে থাকা অটলকে দেখে। বলে, 'কী হয়েছে ? গায়ে চাদর নাও নাই !' শিখা চাদরটা বাড়িয়ে দেয়, 'রাঁধতে ইচ্ছে নাই ? রুটি খাবে, বাঁধাকপির তরকারি আছে। দুপুর থেকে মায়ের জ্বর। খাবে না কিছু। কাল আমাকে বাসি রুটি খেতে হবে। দাঁড়াও—নিয়ে আসছি আমি।'

শিখা রুটি তরকারি নিয়ে আসে। অটলকে জোর করেই খাওয়ায় ধমকানি দিয়ে। শিখার এমন হার্দ্যতা, স্নেহকাতরতা, খেতে দেওয়া, জিজ্ঞাসায় উথলা দরদ অটলের অন্তরকান্নাকে আরও বিগলিত করে।

'এই দেখ, খোকার মত কাঁদে দেখ।'

অটলের সব ইন্দ্রিয় মথিত হয় শিখার কথায়। প্রবল অসহায়ত্বে সহসা দৃঢ়তা অবলম্বিত যখন হয়ে যায়, শূন্যতায় নেমে আসে সম্পদ, একাকিত্বে প্রিয়জনের হাত, অপ্রত্যাশিত এবং অসম্ভবকে তুচ্ছ করে, তখনই শুধু মানুষ এরকম কাঁদতে পারে।

শিখা কোনদিন স্পর্শ করেনি. আজ সে মানুষটার মাথায় হাত রাখে, চুলে বিলি কাটে, তারপর দু'হাতে তুলে দাঁড় করায়, বুকের ঘনতায় শ্বাস ফেলে বলে, 'কেঁদ না, আমি তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব।' যেন নারী জানে অটলের দুঃখ অটলের অপূর্ণতা, কান্নার গভীর গোপন উৎসটির সন্ধান। পুরুষকে বেষ্টন করে কান্না মুছতে উজ্জীবিত করতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মুদ্রা গড়ে, পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দীর্ঘ হয়ে গলায়, কাঁধে, চিবুকে, ঠোঁটে চুম্বনে লালাসিক্ততায় প্লাবিত করে দেয়।

অটল টের পায় তার সব দুঃখ শুষে নিচ্ছে নারী। বিপুল আনন্দস্রোত বইতে শুরু করছে শরীর। নারীশরীরের ঘ্রাণে, উষ্ণ নরম স্তনসন্ধিতে সে মুখ রাখে। শ্বাসবন্ধের মধ্যে সে অনুভব করে ধর্মনদীর বহমানতা শরীরের নখাগ্র থেকে মস্তিষ্ক অবধি। ক্রমে বয়স হারিয়ে এক শিশু হয়ে যেতে থাকে সে। কলকল ছলছল করে ধর্মনদী বইছে। উজ্জ্বল আলোকধারা, দু'পারে সবুজ বনানী, ঢেউয়ের মুকুটে লক্ষ কিরণ—অটল সেই কূল ধরে চিনিকে না, ডলিকে না, শিখাকে না, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার দুঃখী মা কোমরে ঝুড়ি নিয়ে আদুল গায়ে খোলা চুলে আসছে, সে ছুটে চলেছে মায়ের দিকে, বোধিতে কেবল বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া 'মা' ধ্বনি।

শিখা শরীর জানে, পুরুষপ্রবৃত্তির অন্ধতায় রূপযৌবনের হননকামী ক্রিয়ায় ছিন্নভিন্ন হতে জানে, পুরুষ কাঠিনতায় নিজের দেহক্ষুধার যন্ত্রণার সুখস্বাদ জানে, কিন্তু নরম হাড়গোড়ের মাংসল শিশুর নিবিড়তায় তার সত্তায় যে জাগে ভিন্ন ধারা, তাকে রূপান্তরিত করে, অন্য বোধ জাগায়, অন্য আনন্দ অবগাহন বিস্ময় ঊর্ধ্ব ভাসমানতায় পৌঁছে দেয়, এ আশ্চর্য জানা ছিল না। সে আদর করে, চুম্বন দেয়। এক সময় বলে, 'ছাড়। বোকা ছেলে।'

পরের দিন ফটিক আসে সন্ধেবেলায়, শিখা আসবে। শিখার আসা হয় না, ঘরের উঠানে নামতেই ওকে সাপে কাটে। ওঝা, ঝাড়ফুঁক, ওর মায়ের কান্না, লোকের হা-হুতাশ, শিখা বাঁচে না। অটল শোনে, দুঃখ পায়। হৃৎপিণ্ড মোচড়ান কষ্টে সে ক্রুদ্ধ হয় না, অভিসম্পাত দেয় না, সহস্রচক্ষুর দরবারে সে অবনত হয়ে থাকে।

৮

একমুখ গোঁফদাড়ি, মাথার চুল ঘাড় বরাবর, হাতে বালা, প্যান্টের উপর রঙচটা হলুদে পুরু গেঞ্জি, বুকে বর্ণম্লান ফুল, ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াতে অটল চিনতে পারে না। একটু আগে বীজধান নিয়ে গেল নারান, গরু খুলল বাগাল চাকু, সে রান্নার আয়োজন করছে, উঠোনের ওধারে তোলা উনুনে কয়লা লাল শিখার সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে। কালবৈশাখীর দাপটের পর গ্রীষ্ম মশালের পেখম মেলা রোদে তাপহজমী উজ্জ্বলতা।

'কী অটলবাবু কেমন আছেন? চিনতে পারলেন না তো! আমি চণ্ডীদাস। শিবপুরেই শুনলাম আমার সম্পত্তি ভোগ করছেন। কী ভেবেছিলেন আমি ফিরব না! এ কী! একটা চেয়ার কী টুল নেই, বসব কোথা!'

অটল ব্যস্ত হয়ে একটা কাঠের টুল এনে দেয়। বলে, 'এই তো, বসুন। ঠাকরুণ যদি বেঁচে থাকত!'

'তাহলে তুমি কী করে ভোগ করতে বাপ। যাক্ এবার তো ছাড়তে হবে।'

'ছেড়ে দুব। আপনার ধন। এ সব কী আমার! আগুলেছিলাম এই মাত্তর।'

'ছাড়তে কষ্ট হবে না?'

'কষ্ট কিসের লেগে হবে?' অটল বলে মুখ পড়ে। দাড়িগোঁফের এই চণ্ডীদাস এতদিন কোথায় ছিল? মাকে কেন কষ্ট দিল!

'হিসেব ঠিক আছে তো, না ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ।'

'সব ঠিক আছে, সব বুঝিনে দুব। তাহালে একটু চা করি।'

'চা কী। আমাকে তো রেঁধেও খাওয়াতে হবে।' দাবড়ানি ঢঙ সরিয়ে যেন ভেতরের রুদ্ধ বিরক্তি ফেটে বেরিয়ে আসে, 'এরকম হাঁদারাম তুমি কেনে বল দেখি! নিজের আখের গুছুতে জান না? এরপর খাবে কী? চকার ঘরের দশা যা করেছ থাকতে পারবে? চিরকাল শালা বাগাল ছোঁড়াই থেকে গেলে। আমি এসে বললাম, চণ্ডী বটি, বিশ্বেস করে গেলে। চণ্ডী এলে, পথে কেউ দেখত, শিবপুর মোড় থেকেই চাউর হয়ে যেত। উকে পাড়ার সবাই চেনে, তোমার মত কেউ লয়, চেনাকেই চিনতে পার না!'

অটল সরল জিজ্ঞাসায় যায়, 'তাহালে আপনি কে বটেন ?'

প্রচণ্ড রাগ প্রবল ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, 'চিনতে পারছ না ? গলা বুঝছ না ? পোঁতো মুখ দেখেও মনে হল না ?'

'জগা !'

লম্বা শ্বাস ফেলে জগা বলে, 'হুঁশ হল ?'

'কবে ছাড়া পেলি ?' অটল যেন ভাসমানতায় এতক্ষণে ভূমি পায়। পা রাখতে পারে নিজের। জগা ফিরে আসার আনন্দ রেখাটির হিন্দোল সুখ দেয়।

'দিন দশেক হল। তুমি সুখে আছ বামুন ঠাকরুণের ধন পেয়ে শুনে আনন্দ হয়েছিল। টাকার গুণে সম্পত্তির গুণে ভাবলম হয়ত নিজের গুছুতে শিখেছ, বদলে গেইছ। তা দেখছি সে গুড়ে বালি। তুমি মাইরি কী চিজ কে জানে! সন্ন্যেসি লও, ব্যোম ভোলানাথ বলে নেংটি পরে ঘুরছ না, দিব্যি শাঁসে জলে রইছ, অথচ চিটে গুড়ের চিটেন নাই। চণ্ডী তাড়িয়ে দিলে যে ভিক্ষে করে খেতে হবে। বুঝলে, এখনও সময় আছে গুছিয়ে নাও, নিজের বলে কিছু সরাও।'

'চুরি করতে বলছিস্ ! ডাকাতির শাস্তি ভোগ করে এসেও শোধরালি নাই ?'

জগা অগ্রাহ্য করে কথাটা। জেল ভোগের কালো ছায়াহীন অনুশোচনাহীন মুখে শয়তান আরও বলশক্তি পেয়েছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই কাঠির আগুন এঁকে বলে, 'এখনও বলছি, নিজে গোছাও, তা নাহালে আমিই ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাব।'

'তুই আবার ডাকাতি করবি ?'

বিদ্রূপ ঝলসানি সিগারেট ধোঁয়ায়, 'সাধুবাবা হব ভেবেছ ?'

'জেল তোকে ভাল করল না !'

'আরও প্যাঁচ শিখিয়েছে অটলদা, সঙ্গী দিয়েছে, কোলিয়ারি ফিল্ডেও রাজু সিং ডাকবে অ্যাকসানে। যাক্ উ সব ছাড়—চা কর। অনেক বকলাম। তুমি শালা কোনদিন মানুষ হবে না অটলদা—হ্যা।'

চা করে নিজেও এক কাপ খায় অটল। বলে, 'শাঁখার খবর জানিস্।'

'জানি।'

'তোর কষ্ট হয় না ?'

'কষ্ট কিসের ! মেয়েমানুষ নিয়ে বড় হুজ্জোত। ভালবাসা শালা বহুত খতরনাক। খসে শালী ভাল করেছে।'

অটল অপরিচিত ভাষা শোনে। জগা আগুন, দহনই ধর্ম। জেলে একটা

মানুষকে ভাল করার বদলে আরও উগ্র, সাহসী করে দিয়েছে। বলে, 'আছিস্ কোথা এখন তুই ?'

'আমার থাকার ভাবনা। চণ্ডী তোমাকে তাড়ালে পথে দাঁড়াবে। আর জেল থেকে আমি বেরুতে এ ডাকে সে ডাকে। জগার মুখে আহ্লাদ খোলে।

ভাবা যায়। ঘৃণ্য, দাগী, ডাকাতের এমন আদর মিথ্যে বলছে না তো। হুদ্ ওঠে অটলের, 'বলিস্ কী! তারা কারা বটে রে ? কুথাকার ?'

'নাম শুনে কী কাজ! আমার পাশে দাঁড়ানোর কত লোক। তবে বলতে পার লুকিয়ে ছাপিয়ে, আঁধারে, গুপনে গুপনে।'

'গাঁরে গাঁয়ে নাই। ওর মা না খেতে পেয়ে মরেছে। পেহ্লাদ ভিক্ষে করে সাঁইথেতে।'

'জানি।'

'অধর্মের লেগে দলের এমন দশা, চেতন হয়না তোর!'

'দল আবার কী! ডাকাতের দল ভাঙে আর গড়ে। ভাড়া করলেই হল।'

'ভাড়া। ডাকাত ভাড়া।'

'হ্যাঁ। যেমন মুনিশ লাগিয়ে কাজ করায়। বলতে পার হায়ার করা। হায়ার করে খেলায় প্লেয়ার আনে জান ত। খেলার পারাই বটে, তেমনি। টাকা দিয়ে দল গড়ে নিতে হয়, এরকম থাকে না। চণ্ডী তাড়ালে আমি তোমাকেও হায়ার করতে পারি, এক রাতে চার-পাঁচশ পাবে।'

অটল ভেঙে পড়া মানুষের মত বসে থাকে। জগা ঢের অচেনা।

'তাহলে তোমার ঘরেই ঢুকব। চুপচাপ যা জমিয়ে রেখেছ বার করে দেবে। চলি।' জগা হেসে যেন ডাকাতিটা মজার, নিতান্তই কৌতুক, ইয়ার্কির ঢঙে চোখ নাচিয়ে চলে যায়।

জগার আসা অনেকেই দেখেছে। নুটু গেরস্ত জিজ্ঞাসা করল, 'দেঁতো জগা এসেছিল তোর কাছে ? পাত্তা দিবি না। ডাকাতি হলে তোর ঘাড়ে পড়বে। চারুপিসি ঘর বয়ে সাবধান করে দিয়ে গেল। নানু চক্রবর্তী কথা বলে না, বললে ক্রোধাগ্নিবর্ষণ, মওকা পেয়েছে, 'এই যে বামুনের বেটা, ডাকাত পুষছ আবার। ঘাড় ধরে বার করে দেব। পাখা বেরিয়েছে।' অটল জানে, লোকটা তাড়িয়েই দিত। অবিনাশের বিপক্ষ দলের লোক, তাই বাঁচোয়া। অবিনাশ প্রধান, তার সহায়, দেখা হতে বলে, 'জগাকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। হারামজাদা জেলে ছিল ভাল ছিল, এখন কী করে দেখ। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি জগাকে কেউ যেন আশ্রয় না দেয়।'

জগার আশ্রয়ের অভাব নেই, এ ডাকে সে ডাকে, অটলের মনে হয় কথাটা সে

প্রধানকে জানিয়ে দিলে পারে। কী দরকার! ও নামটাই সে ভুলে যাক। তবু এসে পড়ার ভয় থাকে। না, চণ্ডীর জন্য আগলানো দিন ডাকাতি করতে আসবে না, আসবে তার কাছে বসতে, গল্প করতে। কিন্তু কী লাভ! ধর্ম যে মানে না। বুকের মধ্যে ধর্মনদী শুকিয়ে কাঠ। না, অটল তো পারল না নদীতে জল বইয়ে দিতে। ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

দুটো গাইয়ের 'খুড়িয়া' হয়েছে। বড় ছোঁয়াচে। শক্ত খুরের খাঁজে ঘা, হাঁটতে পারে না গরু। 'খুড়িয়া' অন্য রোগও আনতে পারে। আলকাতরা দিলে ঘা শুকিয়ে যায়। কিন্তু দিনকাল বড় খারাপ। শিবপুরে ওষুধ আনতে যায় অটল। সেখানেই বাস মোড়ে বংশীর দোকানে বেঞ্চিতে জগা বসে আছে। জগা তাকে দেখেও দেখে না, অটলও গ্রাহ্য করে না। তারপর আর দেখা নেই। বিহার বর্ডারে আমজোড়া গাঁয়ে ডাকাতি হয়েছে শুনে জগার কথা মনে পড়ে মাত্র।

সকালবেলায় গাঁয়ে হৈ চৈ। চটাই ঘোষাল পেঁপে চুরি করতে নটু গেরস্তর খামারের উঁচু পাঁচিলে উঠেছিল। পেঁপে পাড়বে কী, উঠে আর নামতেই পারে না, এদিকে রাত ফুরিয়ে সকাল, দু দিকে পা ঝুলিয়ে বেচারা এখন মজার দৃশ্য।

চটাইয়ের ছোটখাট চেহারা, ছোট মাথা, গায়ের রঙ আধফরশা, বয়স হলেও গড়নের জন্যে ধরা যায় না। সাজগোজে ফিটফাট, ধুতির উপর শার্ট, হাওয়াই চপ্পল, বাগানো টেরি, ঘাড়ে গলায় শীত গ্রীষ্ম নেই পাউডারের গুঁড়ো, যদিও প্রয়োজনে লাগে না, তবু জামার বুক পকেটে একজোড়া পেন থাকে।

এ চেহারা গাঁয়ে। দুবরাজপুর পাণ্ডবেশ্বর কী লোকপুর থানা এলাকায় গাঁ ঘুরে চটাই ভিক্ষে করে বেড়ায়। পোশাক ব্যাগবন্দী করে ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি পরে, ঘাড়ে গলায় পাউডারের ছোপ মুছে। সবাই এটা জানে। বলতেও ছাড়ে না, কিন্তু চটাই মানতে চায় না, লোকের দরজায় চাইতে পারে, কিন্তু মোটেই ভিখিরি নয়। একা মানুষ, সংসারে কেউ নেই, কোন দুঃখে সে ভিখিরি হতে যাবে। ছেলেরা পিছনে লাগে, 'ভিক্ষে করে চটাই / ঢের পয়সা কামায়।' চটাই ছেলেদের গালাগালি দেয়। লোকে যদি বলে, 'রাগিস কেনে, রাগিস বলেই ছেলেরা অমন করে।' চটাই বলে, 'ভিখিরি বললে সম্মান থাকে। সম্মান গেলে আর রইল কী।'

চটাই ছিঁচকে চুরিচামারি করে। তবে ওই, কুমড়ো লাউ পেঁপে কলা, কোন দামী সামগ্রী নয়। ধানের সময় মাঠে ঘুরে ঘুরে শীষ ছিঁড়ে বেড়ায়। চুরি অভিযোগ ঘর বয়ে কেউ নিয়ে গেলে সাফ কথা, 'দরকার ছিল নিয়েছি, তোমার দরকার থাকলে আমার ঘর থেকেও নিয়ে যেও।' কেউ যদি বলে, 'তাহালে তোর এই

বালতি নিলাম।' অমনি চটাই হাঁ হাঁ করে বালতি আঁকড়ায়, 'আমি কী দেখিয়ে নিয়েছি, তুমি যে বড় দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ।'

পাড়াসুদ্ধ মানুষ নুটু গেরস্তর পাঁচিল গোড়ায়। চটাই ঘোড়া চরা করে বসে। লোকে হাসাহাসি, জিজ্ঞাসা মন্তব্যে সকালের মজা উপভোগ করছে, জিইয়ে রাখছে।

নুটু গেরস্ত বলে, 'চাপলি কী করে?'

'সে কী আমি জানি। তখন তোমার দেওয়াল এত উঁচু ছিল নাকি।'

'ভাগ্যিস চাপলি তাই উঁচু হল।' নুটু গেরস্তও রসিক মানুষ।

'নামাও দেখি। পেঁপে চুরি করতেই পারি নাই। চোর বোলো না।'

'নামাতে পারি। তবে একটা সর্তে। তোর ত খুব সম্মান।'

'বটেই ত। সম্মান গেলে আর রইল কী।'

'ঠিক আছে। বাঁকি আনছি তোকে নামাতে। জোরে জোরে বল, ভিক্ষে করে চটাই, ঢের পয়সা কামায়।'

মুখ গোঁজ করে থাকে চটাই। তবে শেষ পর্যন্ত বলে। হুল্লোড় ওঠে নিচে। 'বাঁকি লাগিয়ে চটাই নামতেই ছেলেরা চেঁচায়, ভিক্ষে করে চটাই, ঢের পয়সা কামায়।' চটাই গালাগালি দেয়, পা ঠোকে, হাত ছোঁড়ে, মারতে যায়। 'তুই তো নিজেই স্বীকার করলি' বলাতে সদর্পে বলে, 'সে তো উঁচু পাঁচিলের ওপর। আমি কী এখন পাঁচিলে আছি?'

অটল হাসির হুল্লোড়ে, রসিকতার কথায়, দেখায় কোন মজাই উপভোগ করে না। চটাই ঘোষাল ক্ষ্যাপাটে মানুষ, তার দুঃখ হচ্ছিল। পিঠে হাত পড়তে ঘাড় ফেরাল, শ্যামদাস, সেই তিলক চন্দনে, কাঁধে ঝোলায় খঞ্জনিতে, ঠোঁটে পুত হাসির ধারায় সারল্যের সাদা পুষ্পশোভায়। ফিস ফিস করে বলে, 'ঘর চল্। তোমার এই পাঁচিলের লোকটার দশা হবে না ত! পেঁপেও পেলে না, নামতেও পারছে না, এদিকে চেপে গিয়েছ, পাঁচিল ঘোড়া, ছোটে না—রাধে কৃষ্ণ।'

'কী যে বল, বুঝি না।'

'রাধে কৃষ্ণ, তোমাকেও যে নামতে হবে। শোন নাই শুনবে। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা, চণ্ডীদাসের চিঠি এসেছে, মাকে লিখেছে গাঁয়ে আসবে।'

অটল দাঁড়িয়ে পড়ে। পলকহীন দৃষ্টি শ্যামদাসের উপর ফেলে, যেন চকানিটা হজম করে নিল! বলল, 'ভালই হল। আর দায় বইতে হবে না। তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।'

'বল কী। একেবারে বৈরাগ্য। রাধেকৃষ্ণ, শূন্যের শোকে বৈরাগী হবে, সংসার ছাড়বে—আমি তো জানতুম তুমি ভিন্ন পাত্র।'

'আমার সংসার কোথা যে ছাড়া ধরা।'

'দুঃখের আঁশটে গন্ধ কেনে বাবাজী, দীর্ঘশ্বাস কেনে?'

'দুঃখ কিসের। ঠাকরুণ বেঁচে থাকলে কত ভাল হত।'

'তাহলে তোমার সুখভোগ হত না, জীবনের কারবার ধারে হয় না, সব নগদে। রাধেকৃষ্ণ চল ঘর চল, চা মুড়ি খাওয়াবে।

চা মুড়ি খেয়ে শ্যামদাস বলে, 'চিন্তায় পড়লে, রাধেকৃষ্ণ, চিন্তা থাকলে মানুষ কী, তবে বেশি পাকাবে না, তোমার ধর্মনদীতে বান ডাকাও, ভাসিয়ে নিয়ে যাক্ পরের ঘরে সুখের বাস। শুনে জলের কলকল ছলছল, দুপাড়ে দেখ সবুজের ঢেউ, রোদে বাতাসে আনন্দ লহরী, রাধেকৃষ্ণ।'

শ্যামদাস ভাত খায় না। বলে, 'পেটের বাঘ বলছে খাব না এখানে। পায়ের চাকা সরসর করছে, থাকি কী করে বাবাজী—রাধেকৃষ্ণ—চলি।'

চণ্ডীদাস চক্রবর্তীর প্রত্যাবর্তন গোপালপুরের এক জব্বর সংবাদ বটে। ঘরে উঠোনে দাওয়ায় গ্রামের মানুষ ভীড় করে। চণ্ডীদাস সুরাটের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করছিল এতদিন। নানা জায়গা ঘুরে সুরাট পৌঁছান তার সেও এক বিচিত্র বৃত্তান্ত। যাহোক মায়ের কথা তার মনে হত বৈকী। ভেবেছিল অনেক টাকাকড়ি নিয়ে সে ফিরবে, মাকে দেখাবে ছেলে তার নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সে কারণেই আসেনি, চিঠিপত্রও দেয়নি। এই যে এসেছে এটা হঠাৎই ঘটে গেল। অসুখ করেছিল। অসুখ ভাল হল কিন্তু মায়ের জন্যে মন কাঁদা থামে না। তাই ছুটে এসেছে।

চণ্ডীদাস তো বলে, তবু লোকের কতই না জিজ্ঞাসা, কতই না সমাদার, যেন গাঁয়ের মানুষ হা-পিত্যেশ হয়ে বসেছিল, চণ্ডীবিহনে গাঁ খাঁ খাঁ করত। নানু চক্রবর্তী ঘর বয়ে এসে বলল, 'বেশ করলি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলি। গাঁ না মা। মা না থাকলে কী হবে, গাঁ তো আছে। আমরা কী পর। আজ আমার ঘরে খাবি। জলখাবারও পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তো নেমন্তন্ন করার জন্য ব্যগ্র সব পড়শীই। স্নেহ ঝরানিও কথায়, 'চেহারা কী করেছিস্। কী সুন্দর তোর চেহারা ছিল।'

অটলের মনে পড়ে না। তবে এখন দেখে, ক্ষয়া বুড়োটে চেহারা, চোখ ঢোকা, ঝরণা রঙ কালিবর্ণ, হাত পা শির ওঠা, কেঠো, আঙুল শুকো কাঠি, পোশাকেও

বোঝা যায় মানুষটা সুখে ছিল না। অভাবের হাতে ছুরি থাকে, চেহারায় সে দাগ টানে।

গাঁয়ের লোক সরতে অটল বলল, 'তাহলে নিজের জিনিস বুঝে নাও। আমার দায় মিটুক। ঠাকরুণকে কথা দিয়েছিলাম, সাধ্যিমত রেখেছি।'

শিবপুর মোড়ে নামার পর থেকে এই মানুষটা সম্পর্কে ঢের কথা শুনেছে। ভাবে-ভঙ্গীতে কথায় বোঝায়নি মনের ভাব। এখন বলে, 'তুমি যাবে কোথা? থাকবে আমার সঙ্গে।'

'গেরস্ত আমার থাকা ছিল আগুলতে। তুমি এসেছ।'

'তো কী হয়েছে। আগুলবে. আমাকে রান্নাবাড়া করে খাওয়াবে, ঘর দেখবে।'

অটল জিভ কাটে, 'বামুনের ছেলে আমার হাতে খাবে কী গো।'

'সে বুঝব আমি। আপত্তি কিসের। গাঁয়ের লোকের জন্যে।'

অটল বলল. 'রাঁধার অনেক লোক পাবে গেরস্ত।'

'না। তুমিই থাকবে। তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি, তোমার মত মানুষ হয় না।'

অটল এতটা ভাবেনি। বিদায়ের প্রস্তুতি গড়ে নিয়েছিল, এখন একথায় তার মনে হয় দায় ফুরোয়নি। একজন ভালমানুষের জন্যে একা মানুষের জন্য তার থাকা কর্তব্যও বটে। এতদিন অন্ন খেয়েছে, সে তো ঋণী। ঠাকরুণের কাছে, তার বেটার কাছে।

সন্ধেবেলায় চণ্ডী বলে, 'যাও দেখি একটা বোতল নিয়ে এস তারকের ঘর থেকে —লুকিয়ে আনবে।'

অটলের উপর হুড়মুড় করে যেন পড়ে যায় ঘরের চাল। ভাদুরে সন্ধ্যার চাপা গুমোট বাতাস ছিনিয়ে নেয়। ভাবে, একবার গাঁ ঘুরে এসে, তারক চোলাই বিক্রি করে সংগ্রহ করে ফেলেছে, ঠাকরুণের বেটা মাতাল, বাইরে এক ভেতরে অন্য এই মানুষ, আঘাত দেয়, কষ্ট হয়। কাঁপা ঠোঁটে বেরিয়ে আসে, 'তুমি মদ খাও!'

'আরে অবাক হবার কী আছে! খাবার জিনিস খাব না!'

'মদে সর্বনাশ হয়, মানুষ নষ্ট হয় গেরস্ত।'

চণ্ডী ঠোঁটে বিড়ি রেখে আদেশ দেয়, 'যাও নিয়ে এস।'

অটলকে আনতে যেতে হয়। এবং দিনগুলি তার কাছে কালো হয়ে আসে। শুধু তো মদ নয়, আহারে, জামাকাপড়ে, লোক আপ্যায়নে চণ্ডীদাস বিলাসিতা শুরু করে দেয়। শূন্য হাতে এসেছে। অটলের জমানো ধান বেচা টাকায় তার

হাত। না, নিজে হাতে নেয় না, অটলকে আদেশ দেয়। গাঁয়ের লোককে বুঝিয়ে নেয়, সুরাটে তার বিশাল উপার্জন হয়েছে। গোপালপুর অবাক হয়।

রসপুরের ফুটবল টুর্নামেন্ট তিনমাস আগে শুরু হয়েছে। সপ্তাহে একদিন রবিবার খেলার আয়োজন। তারপর বৃষ্টি, চাষের ব্যস্ততায়, গ্রীষ্ম ছেড়ে শরৎ ছুঁয়ে ফেলল। বিভিন্ন জায়গায় হায়ার করে অনুষ্ঠান খেলার। যে গাঁয়ের খেলা তাদের একটাও ছেলে নেই, সব প্লেয়ার হায়ার এমনও হয়। লোকে খেলা দেখতে চায় ভাল। নিজেদের ছেলেরা আর কী খেলবে। এই খেলাও যেন অঞ্চলে আমোদ। গোপালপুর সেমি ফাইনালে উঠেছে।

ক্লাব ক্যাপ্টেন, সেক্রেটারি অখিলকে ডেকে পাঠাল চণ্ডীদাস।

'অখিল গোপালপুরে শীল্ড আনা চাই।'

'কেমন করে আনব কাকু। সেমি ফাইনালে কোনক্রমে উঠেছি। রসপুরে পার্নপুর থেকে ফুল-সেট আনছে অগ্রগামী। শীল্ড ওরা গাঁয়ে রাখবেই।'

'তোরাও আন। অগ্রগামীকে যারা হারাতে পারে।'

'পুমকাতে রয়েছে। ওরা অনেক টাকা চাইছে।'

'দেওয়া হবে। আমি দেব। জিতলে খাসি কেটে ফিস্টি হবে।'

'তুমি দেবে, তাহালে ব্যবস্থা করি।' অখিল ব্যস্ত হয়।

'হ্যাঁ কর, গাঁয়ের মান রাখতে হবে। শীল্ড চাই-ই।'

গোপালপুরে শীল্ড এল, খাসি কেটে ফিস্ট ব্যাগপাইপ বাজনা নিয়ে গাঁ ঘোরা। শামনু ঠাকরুণের সোনারহার, কানের দুল, আংটি গেল। না, অটলকে বিক্রি করতে হয় না। নানু চক্রবর্তীর ঘরে শুধু পৌঁছে দিয়ে আসা। চণ্ডীদাসের জন্যে নানুরই বেশি দরদ।

অটল বড়ই বিপযস্ত হয়ে পড়ে। নানু চক্রবর্তীর তার উপর ঈর্ষার আগুনে চণ্ডী ইন্ধন হয়ে পড়েছে। প্রধানকে সে বলে, নুটুগেরস্তর কাছে ছুটে যায়। ওরা বলে, তোর কী। চণ্ডি সেরকমই আছে। স্বভাব কবে কোথায়। নিজের ধন ও ওড়ালে বলার কী আছে। ফলে অটলের প্রতিরোধহীন অসহায় মুষ্টিপাক, বুকে দোমড়ান কষ্ট, ঠাকরুণের ধন নিঃশেষিত হওয়ার হাহাকার, চণ্ডীর বিলাস ঔদাসীন্য, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়ায় নিষ্প্রভতা নিয়ে দিনযাপন।

'গেরস্ত একডুং বুঝে চল।'

'জ্ঞান দিও না। কাজ করে যাও।'

'সব শেষ হয়ে গেল।'

'শেষ হয়ে গেল বলে একটু আনন্দ করব না ? দু'টো পয়সা খরচা করি, একটু মদ খাই। সংসার নাই, মেয়েমানুষ নাই, বিরক্ত করো না'তো ! কাজ কর। চণ্ডীদাস সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ শূন্যে ছোঁড়ে, বাতাসে ভাঙে।

ভাদ্রের শেষদিকে অটলকে না জানিয়ে চণ্ডীদাস নিরুদ্দেশ হয়। যেন সে কয়েকদিনের খেলা করতে এসেছিল। বর্ষা শান্ততার পর নির্মেঘ আকাশ কাল থেকে আবার মেঘে সেজেছে, টিপটাপ বৃষ্টি, মৃদু হিমেল সামান্য ঝড় নিয়ে আঁধারে দিনের পরিমণ্ডল। তার মধ্যে এঘর-ওঘর ঘোরা, নানাজনে জিজ্ঞাসা, শিবপুর মোড়ে বাস দেখতে পাওয়া অটল উদ্বিগ্নতায় না খেয়ে দুর্ভাবনা বোঝা মাথায় নিয়ে দাওয়ায় আলো জেলে বসে থাকে। সামান্য শব্দে চমকায়। বিনিদ্র রজনী একসময় শেষ হয়, আলো ফোটে। আকাশের মেঘ সরে যায়নি। আলগা বৃষ্টির ধারার বাতাসে দোলানি খেয়ে ফেরে। উঠোন ভিজছে, ঘরের চালের ধারাপাতের শব্দ। ঠাকরুণ যে দায় দিয়ে গিয়েছিল। অটলের মনে হতে থাকে, তার চেয়েও বড় দায় তার উপর বর্তেছে। চণ্ডীদাসকে সে যে কোথায় খুঁজে পাবে।

খোঁজার প্রয়োজন হয় না। অটলের দায়ও থাকে না। নানু চক্রবর্তী ছাতা-মাথায় বার্তা শোনায়, 'ওরে অটল পথ দেখ এবার। চণ্ডী ওর স্থাবর-অস্থাবর সব বেচে দিয়ে গিয়েছে আমাকে, মায় গরু বাছুর, ঘরের সামগ্রী। সিউড়ী কোর্টে রেজিস্ট্রি হয়েছে। মুখ্যু মানুষ দলিল বুঝবি কী, তোর পেধানকে বলবি, ইচ্ছে হলে দেখে যাবে। দু' ঘণ্টা সময় দিছি। দখল দুব। সরে পড় ভালয় ভালয়।'

অটল অবাক হয়। টের পেয়ে নিভার হয়ে গেল সে। বসে ছিল, উঠে বৃষ্টি ঝিরঝিরানিতে কাদাটে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে, 'দখল লাও গেরস্ত। আমি চললাম।'

'আরে তোর জিনিসপত্তর।'

'এক জামাকাপড়ে এসেছিলম, যেছিও। বকনটি রইল, গাভিন্ বটে।'

'তোর বকন কোথা ! হ্যাঁ, ওটাও আমাকে বেচেছে।'

'তাহলে ত ভালই। কোথা রাখতম্ তার ঠিকঠিকানা নাই। চলি গেরস্ত।'

হতভম্ব নানু চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষ এত সহজও হয়।

বিকেলে বৃষ্টি মোছে। শরৎ ঝকঝকানি রোদ, আকাশ বিশাল নীল শাড়ির ফুলে ওঠা দিগন্ত বিস্তারী ছত্র, সাদা কাশফুলের সোহাগ হাসি খালের ধারে, ধানের ক্ষেতে সবুজ তরঙ্গ, পাতলা হিমের সকাল সন্ধে—পুজো আসছে। খুশির বাজনা প্রকৃতির নূপুরে নানাভাবে বাজে, মানুষের হৃদিতে তারই দোলাচল। কিন্তু চকা গোপালপুর কেন্দ্রিক গ্রামগুচ্ছে যে শ্রেণীটির সংখ্যাধিক্য তাদের কাছে শরৎ আগমন

তো, কর্মহীনতার, অন্নহীনতার, ঘরে হাঁড়ি শূন্যতার, পিতল কাঁসা কী অন্য সামগ্রী বন্ধক দেওয়ার অসহায়তার। এক ফসলী জমি সেই অগ্রহায়ণে ধান দিয়েছে। চাষ লাগতে মুষ্টি মুক্ত হয়েছিল সম্পন্ন চাষীর, বাবুদের, মিটতে মুষ্টিবন্ধ। সবুজ শস্যভূমি আগামীর সম্ভাবনায় ঘাড় দোলায়, ধানের পাতায় অপেক্ষার শিশির জমে।

দুঃখের এই কালে অটলের সব খুইয়ে চকায় প্রত্যাবর্তন আত্মীয়তা পায়। দরিদ্রকে দারিদ্র বিমুখ করে না। যারা ঈর্ষায় জ্বলছিল, তাদের নিবৃত্তি সুখ হয় না অটলের মনগর্ব ছিল না। ফলে এ অবস্থার জন্য 'বেশ হয়েচে' উৎফুল্লতা কারও নেই। সান্ত্বনা দিতে ঘরে আসে পরেশ, মুড়ি এনে দেয় মালতী। ভুতো বলে, ভাবনা কী আমরা আছি। এদিকে গাঁঠিপাল নাই, ঘরের চালে খড় নাই বেকারি যাই, কাজ নাই, অন্নের কোন সংস্থান নাই, দেওয়াল বর্ষায় ক্ষতবিক্ষত, অব্যবহারে সাপখোপের আস্তানা হয়েছে, দু'চারটে টিন, মাটির হাঁড়ি, বালতি, এলুমিনিয়ামের থালা বাটি, কাঁথা, টিনের বাক্স ছিল, কে কখন বের করে নিয়েছে, কে জানে, এ সব সংগ্রহ করতে হবে। ভুতো ঘরের সামনে উদাস হয়ে বসে থাকতে দেখে ডেকে নিয়ে যায়, খেতে দেয়। তবে একদিনই। পরদিনই সে ঘর পরিষ্কার করে। মিতি একটা খেজুর-পাতার তালাই দেয় শোবার জন্যে। কুমোরঘরে ধারে মাটির হাঁড়ি, একটা পাতনা কিনে আনে, রাম সাধুর মুদীর দোকান থেকে ধারে চাল, রান্না করে খায়। ধার সে শোধ করে দেবে। দিতে কেউই ব্যাজার হয়নি। সঙ্গে মহানুভূতিও দেখিয়েছে। দিব্যি সে রাত কাটায় খড়ের ছাউনিহীন শূন্যঘরে।

নানু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অটলের জন্যে কেউ যায় না। নিন্দে করে অটলের কাছে। তোলে অধিকার, ভোগ দখল সূত্র ইত্যাদিও। প্রধান অবিনাশ বলল, 'দলিল যখন করিয়ে নিয়েছে কিছু করার নেই। কিন্তু গাভিন বকনটা তোমার। ওটা আদায় করে দিতে পারি। পঞ্চায়েতে তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

'দরকার নাই পেধানবাবু। ওখানেই থাকুক।'

'আরে চোরের উপর রাগ করে করে ভুঁইয়ে ভাত খাবে!'

অটল বলল, 'আমার ত রাগ হয় নাই। আহা ঠাকরুণের ছেলেট—।'

'আহা করছ কী! তোমার কথা ভেবেছে! ও কী একটা মানুষ।'

অটল বলে, 'মানুষই বটে। তবে অধমের—।'

অবিনাশ বলে, 'এ সপ্তাহে কাজ তুমি পাবে। ইলেকট্রিকের পোল পড়ছে। কন্ট্রাক্টর স্থানীয় লেবার নেবে।'

লাল রঙের নতুন সাইকেল নিয়ে জগা আসে। ঝকঝকে সাইকেলের মত জগার

চেহারাতেও ঝকঝকানি। শীর্ণ রেখার গোঁফ, দাড়ি কামান, নীল গেঞ্জি, সাদা প্যাণ্ট, হাতে ঘড়ি। হেসে বলল, 'আজই তোমার খবর পেলাম। জানতম শালা এলেই তাড়াবে শনি্য হাতে। টাকা উড়ছে শুনে লুটে নিবার মন হয়েছিল। তুমি রইছ, শেষে দোষ পড়বে তোমার উপর—চুপ্ মেরে গেলম। তা ছাড় ইবার ভালমানুষী। নানু চক্রবর্তীকে দেখতে হলে আমার সঙ্গে এস!'

জগা থামতে অটল বলল, 'তুই আমার কাছে আসিস্ না জগা। ভেবেছিলম ভাল হবি—আমি হার মেনেছি।'

'আরে ভাল হলে ত তোমার দশা হত। খেতে পেতম্ না। সারা জেবন ভাল হয়ে হিসেবট দেখ, পেলে কী? চিরকাল গরুর লেজ মুচড়ে গেলে বাগালিগিরিতে, বর্গাদার হবার ভাগ্যি হল না, বোকে বিনি চিকিচ্ছেতে মারলে, ভালবৌদিকে সংসার দিতে পারলে না, মাথায় চাল নাই আকাশ মাথায় নিয়ে ভালাইয়ে শুছ, ভালমন্দ খাবে কী, পেটে ভাত নাই, উপকার করলে—তাড়া খেলে। আমাকে দেখ। শাঁখার কথা বলবে? মাগীর অভাব, রাণীশ্বর চল, চাঁপা আছে, শাঁখার ডবল ভালবাসা, ডবল সুন্দরী। অভাব নাই। বিলিতি খাই, মাংস খাই, জামা প্যাণ্ট দেখ, লোকে ডরায়, রাজার মত থাকি।

'তুই কী এ সব কথাই শুনুতে এলি?'

'জানি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগছে।' জগা বসে না। সিগারেট ধরায়, ধোঁয়া ছাড়ে। বলে, 'একদিন বাঁচিয়েছিলে, সেই টান ভুলতে পারি না, জেলে বসেও তোমার কথা মনে হত। তুমি ভুল না আমি ভুল। তা দেখাছ শালা তুমিই ভুল। না এসেও থেকে পারি না। তুচ্ছ করেছ আমাকে। আমি বেঁচে আছি, তুমি মরছ।'

'তুই বেঁচে কোথা! তুই ত মরা।'

'অ্যাঁ। জগা হা হা করে হাসে, 'কে মরা, লোককে শুধোও। ভক্ত করতে পারি না। শোন, শিবপুর মোড়ে বংশীর দোকানে খবর দিলেই আমি আসব।

তোর লেগে আমার কষ্ট হয় রে জগা।'

জগা বলে, 'হয়—তাহলে চলে এস!'

অটল সস্নেহে ডাকে, 'তুই-ই আয় জগা।'

জগা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কোন কথা বলে না, সাইকেলে ওঠে।

পরদিনই অটল ইলেকট্রিক লাইনে কাজ পায়। বিদ্যুৎ আসবে গাঁয়ে, নুটু গেরস্ত বলে, 'বুঝলে আলো আসছে। এরপর টিভি। শিবপুর থেকে রাস্তাটাও হয়ে যাবে। বাস আসবে গাঁ পর্যন্ত। চকা ছেড়ে কাজ করতে বাইরেও যাবে গাঁয়ের মুনিষ। তখন উন্নতি দেখবি। তা ঘর করিস, বাঁশ খড় আমি দেব—কাজ করে শোধ দিবি।

অটল মাটি কাটে, জলে ভিজিয়ে 'তাওয়ন' মাথে পা দিয়ে, পরদিন দেওয়ালে মাটি দেয়। এ কাজটা সকাল সন্ধে। আটটা থেকে পাঁচটা মজুর খাটে ইলেকট্রিক লাইনে। চরম পরিশ্রমেও ক্লান্তি অনুভব করে না। পুজোর দূরাগত গন্ধে সে

আনন্দ সৌরভ পায়, আকাশের নীল, পাখির উড়ন্ত ডানা, ধানক্ষেতের হরিৎ ঢেউ, নিঃশব্দ শিশির পাত, বাতাসে হিম হিম আদর সকলই যেন খুশির বার্তাবহ। অটলের যেন অতীত নেই, অনুশোচনা নেই, চিনি নেই, ডলি নেই, শিখা নেই, জগা নেই, বামুন ঠাকরুণ নেই, চণ্ডীদাস নেই, নানু চক্রবর্তী নেই, চকা নেই, গোপালপুর নেই, প্রাপ্তি নেই, অপ্রাপ্তি নেই, বেদনা নেই, বিষণ্ণতা নেই। অনেকদিন পরে বুকের মধ্যে তার সরবতা ধর্মনদীর। তালাইয়ে শুয়ে রাতের আকাশ সে ঘরশূন্য চালের ফাঁকে দেখতে পায়। খণ্ডিত হয়ে নক্ষত্রের বাতি জ্বালায় আকাশ, সমাদরের চাঁদ জ্যোৎস্নায় ভাসায়, রাতচরা পাখির ডানায় চেরা শব্দের রেখা আঁকা হয়, পাতলা ঘুম তন্দ্রার স্নেহ আবেশে সে শরীরের অভ্যন্তরে ধর্মনদীর বহমানতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। নদী বইছে কলকল ছলছল। শব্দ থেকে ধোঁয়া সরিয়ে ভাস্বর হয়, ক্রম উজ্জ্বলতা। অমৃত স্রোতস্বিনী আলোর মুকুট নিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ গড়ছে। দু'তীরে তার সবুজ ঐশ্বর্যের সমারোহ, এঁকেবেঁকে পাহাড় অরণ্য জনপদের অলঙ্কার অঙ্গে জুড়ে পার হয়ে হয়ে বইছে। কত দূর কত দীর্ঘ যে সুন্দর নির্মাণের যাত্রা—অন্তহীন, কালহীন। বোধ আর বোধহীনতার আলো ছায়া জলরাশির কেবলই শব্দ। কলকল ছলছল। নদী বয়, আনন্দ বয়।

একদিন সহদেবমাস্টার চেয়ারে বসে হাঁক পাড়ল, 'এই অটল শোন্ শোন্।' কাছে আসতে বলল, 'চল্লি কোথা? পোল ত পুতছিস্ আলো কবে আসবে?'

'তা কী করে জানব।'

'রাস্তাতে পাথরও পড়ছে। দেখা যাক্ কবে হয়। ঘর তাহালে তোর হল। ইস্ কী ঠকান তোকে ঠকাল। কী সুখে তুই ছিলি।' অটলকে চলে যেতে দেখে বলে, আরে যাবি এখন। তোর দুঃখ বুঝি—। দুঃখেরই তো কথা।'

'দুঃখ কিসের গো আমার। দিব্যি আছি। ধম্মনদীর বান ডাকলে খালি আনন্দ।'

'ধম্মনদী। ও আবার কী?' সহদেবমাস্টার ভ্রূ কোঁচকায়।

'শ্যামদাস বরিগী বলেছে। সবার বুকে থাকে। হাত দিয়ে দেখ।' অটল হাঁটে।

সহদেবমাস্টার ধন্দে পড়ে, বুকে হাত রাখে। তারপর ভেবে নেয়, শ্যামদাস বৈরাগী বলেছে! আউল বাউল, বৈষ্ণববৈরাগী, সাধুসন্ত, ওঝা আর গুপ্তবিদ্যাধররা আলটপকা ইঙ্গিতধর্মী বহু অর্থবহ গভীর রহস্যময় এরকম কথা বলেই থাকে। কাজ কী সংসারী মানুষের অমন জটিল ধোঁয়াটে ঘূর্ণিপাকে। তবে এটা তো ঠিক ধম্মনদী হোক আর অন্য কিছু নাম হোক, কিছু তো বটেই, আছেই, থাকেও নইলে বোকাটা এত কাণ্ডের পর এমন প্রফুল্ল থাকে কী করে।

বড় বড় চোখ করে সহদেবমাস্টার দেখে খাড়া একটা মানুষ লম্বা পায়ে হাঁটছে।

—